ক্ষীরের পুতুল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর



ক্ষীরের পুতুল



ক্ষীরের পুতুল

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রথম আনন্দ সংস্করণ জানুয়ারী ১৯৮৬ মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০
দ্বিতীয় মুদ্রণ অগস্ট ১৯৮৬ মুদ্রণ সংখ্যা ৫৫০০
তৃতীয় মুদ্রণ ডিসেম্বর ১৯৮৬ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০০
চতুর্থ মুদ্রণ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮ মুদ্রণ সংখ্যা ১০০০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ আশিস সেনগুপ্ত

আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং
আনন্দ প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে
পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০ ০৫৪ থেকে
তৎকর্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য ১০·০০



এক রাজার দুই রানী দুও আর সুও। রাজবাড়িতে সুওরানীর বড় আদর, বড় যত্ন। সুওরানী সাতমহল বাড়িতে থাকেন। সাতশো দাসী তাঁর সেবা করে, পা ধোয়ায়, আলতা পরায়, চুল বাঁধে। সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুল, সেই ফুলে সুওরানী মালা গাঁথেন। সাত সিন্দুকে-ভরা সাত-রাজার-ধন মানিকের গহনা, সেই গহনা অঙ্গে পরেন। সুওরানী রাজার প্রাণ!

আর দুওরানী—বড়রানী, তাঁর বড় অনাদর, অযত্ন। রাজা বিষ নয়নে দেখেন। একখানি ঘর দিয়েছেন—ভাঙাচোরা, এক দাসী দিয়েছেন—বোবা-কালা। পরতে দিয়েছেন জীর্ণ শাড়ি, শুতে দিয়েছেন—ছেঁড়া কাঁথা। দুওরানীর ঘরে রাজা একটি দিন আসেন, একবার বসেন, একটি কথা কয়ে উঠে যান।

সুওরানী—ছোটরানী, তাঁরই ঘরে রাজা বারো-মাস থাকেন।

একদিন রাজা রাজমন্ত্রীকে ডেকে বললেন—মন্ত্রী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তুমি জাহাজ সাজাও।

রাজার আজ্ঞায় রাজমন্ত্রী জাহাজ সাজাতে গেলেন। সাতখানা জাহাজ সাজাতে সাত মাস হয়ে গেল। ছ'খানা জাহাজে রাজার চাকর-বাকর যাবে, আর সোনার চাঁদোয়া-ঢাকা সোনার জাহাজে রাজা নিজে যাবেন।

মন্ত্রী এসে খবর দিলেন—মহারাজ, জাহাজ প্রস্তুত।

রাজা বললেন—কাল যাব।

মন্ত্রী ঘরে গেলেন।

ছোটরানী—সুওরানী রাজ-অন্তঃপুরে সোনার পালঙ্কে শুয়েছিলেন, সাত সখী সেবা করছিল, রাজা সেখানে গেলেন। সোনার পালঙ্কে মাথার শিয়রে বসে আদরের ছোটরানীকে বললেন—রানী, দেশ-বিদেশ বেড়াতে যাব, তোমার জন্য কি আনব ?

রানী ননীর হাতে হীরের চুড়ি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে বললেন,—হীরের রঙ বড় শাদা, হাত যেন শুধু দেখায়। রক্তের মতো রাঙা আট-আট গাছা মানিকের চুড়ি পাই তো পরি।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানী, মানিকের দেশ থেকে মানিকের চুড়ি আনব।

রানী রাঙা-পা নাচিয়ে-নাচিয়ে, পায়ের নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে বললেন—এ নূপুর ভালো বাজে না। আগুনের বরন নিরেট সোনার দশগাছা মল পাই তো পরি।

রাজা বললেন—সোনার দেশ থেকে তোমার পায়ের সোনার মল আনব।

রানী গলার গজমতি হার দেখিয়ে বললেন—দেখ রাজা, এ মুক্তো

বড় ছোট, শুনেছি কোন দেশে পায়রার ডিমের মতো মুক্তো আছে, তারি একছড়া হার এনো।

রাজা বললেন—সাগরের মাঝে মুক্তোর রাজ্য, সেখান থেকে গলার হার আনব। আর কি আনব রানী ?

তখন আদরিনী সুওরানী সোনার অঙ্গে সোনার আঁচল টেনে বললেন—মা গো, শাড়ি নয় তো বোঝা ! আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পাই তো পরে বাঁচি।

রাজা বললেন—আহা, আহা, তাই তো রানী, সোনার আঁচলে সোনার অঙ্গে ছড় লেগেছে, ননীর দেহে ব্যথা বেজেছে। রানী হাসিমুখে বিদায় দাও, আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি আনিগে।

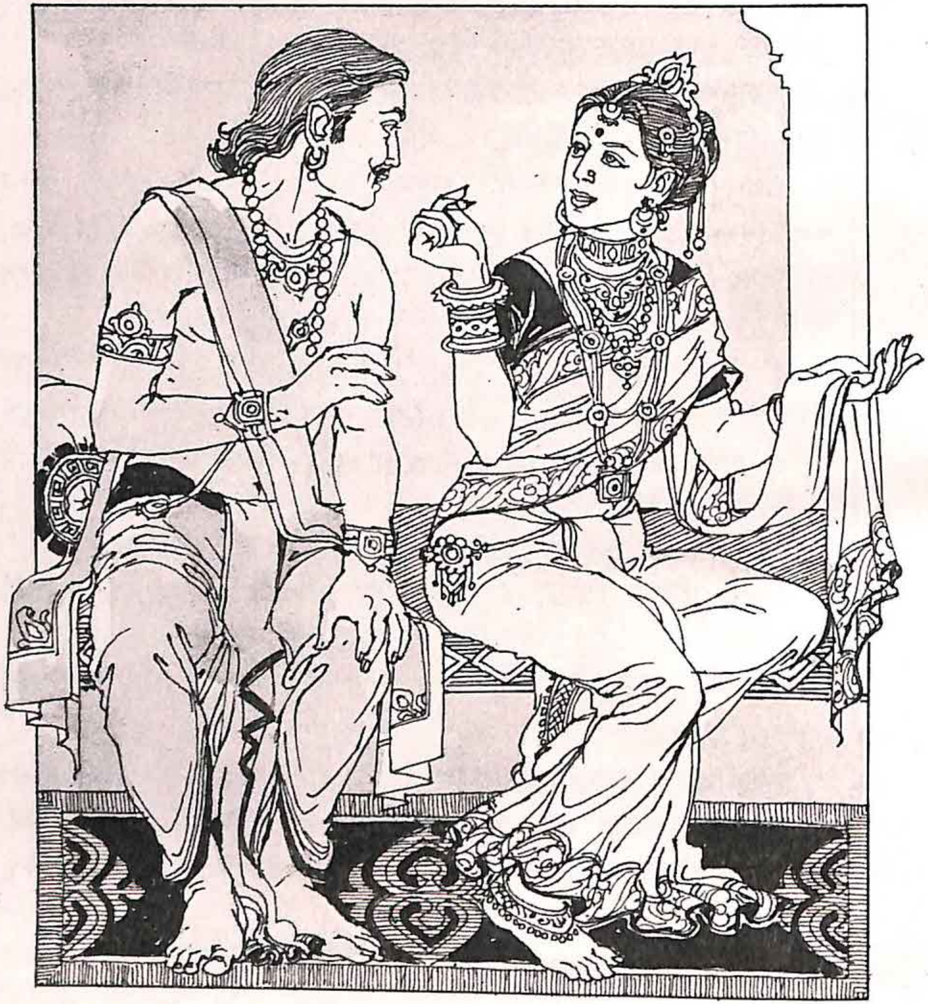
ছোটরানী হাসিমুখে রাজাকে বিদায় করলেন।

রাজা বিদায় হয়ে জাহাজে চড়বেন—মনে পড়ল দুঃখিনী বড়রানীকে।

দুওরানী—বড়রানী, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে কাঁদছেন, রাজা সেখানে এলেন।

ভাঙা ঘরের ভাঙা দুয়ারে দাঁড়িয়ে বললেন—বড়রানী, আমি বিদেশ যাবো। ছোটরানীর জন্য হাতের বালা, গলার মালা, পায়ের মল, পরনের শাড়ি আনব। তোমার জন্য কি আনব ? বলে দাও যদি কিছু সাধ থাকে।

রানী বললেন—মহারাজ, ভালোয় ভালোয় তুমি ঘরে এলেই আমার



সকল সাধ পূর্ণ হয়। তুমি যখন আমার ছিলে তখন আমার সোহাগও অনেক ছিল, সাধও অনেক ছিল। সোনার শাড়ি অঙ্গে পরে সাতমহল বাড়িতে হাজার-হাজার আলো জ্বালিয়ে সাতশো সখীর মাঝে রানী হয়ে বসবার সাধ ছিল, সোনার পিঞ্জরে শুক-শারীর পায়ে সোনার নূপুর পরিয়ে দেবার সাধ ছিল। মহারাজ, অনেক সাধ ছিল, অনেক সাধ মিটেছে। এখন আর সোনার গহনায়, সোনার শাড়িতে কি কাজ ? মহারাজ, আমি কার সোহাগে হীরের বালা হাতে পরব ? মোতির মালা গলায় দেব ? মানিকের সিঁথি মাথায় বাঁধব ? মহারাজ, সেদিন কি আর আছে ! তুমি সোনার গহনা দেবে, সে সোহাগ তো ফিরে দেবে না ! আমার সে সাতশো দাসী সাত মহল বাড়ি তো ফিরে দেবে না ! বনের পাখি এনে দেবে, কিন্তু মহারাজ, সোনার খাঁচা তো দেবে না ! ভাঙা ঘরে সোনার গহনা চোর-ডাকাতে লুটে নেবে, ভাঙা খাঁচায় বনের পাখি কেন ধরা দেবে ? মহারাজ, তুমি যাও, যাকে সোহাগ দিয়েছ তার সাধ মেটাও গে, ছাই সাধে আমার কাজ নেই।

রাজা বললেন—না রানী, তা হবে না, লোকে শুনলে নিন্দে করবে। বল তোমার কি সাধ ?

রানী বললেন—কোন লাজে গহনার কোথা মুখে আনব ? মহারাজ, আমার জন্য পোড়ামুখ একটা বাঁদর এনো।

রাজা বললেন—আচ্ছা রানী, বিদায় দাও।

তখন বড়রানী—দুয়োরানী ছেঁড়া কাঁথায় লুটিয়ে পড়ে কাঁদতে-কাঁদতে রাজাকে বিদায় দিলেন। রাজা গিয়ে জাহাজে চড়লেন।

সন্ধ্যাবেলা সোনার জাহাজ সোনার পাল মেলে অগাধ সাগরের নীল জল কেটে সোনার মেঘের মতো পশ্চিম মুখে ভেসে গেল।

ভাঙা ঘরে দুওরানী নীল সাগরের পানে চেয়ে, ছেঁড়া কাঁথায় পড়ে রইলেন। আর আদরিনী সুওরানী সাতমহল অন্তঃপুরে, সাতশো সখীর মাঝে, গহনার কথা ভাবতে ভাবতে, সোনার পিঞ্জরে সোনার পাখির গান শুনতে-শুনতে, সোনার পালঙ্কে ঘুমিয়ে পড়লেন।

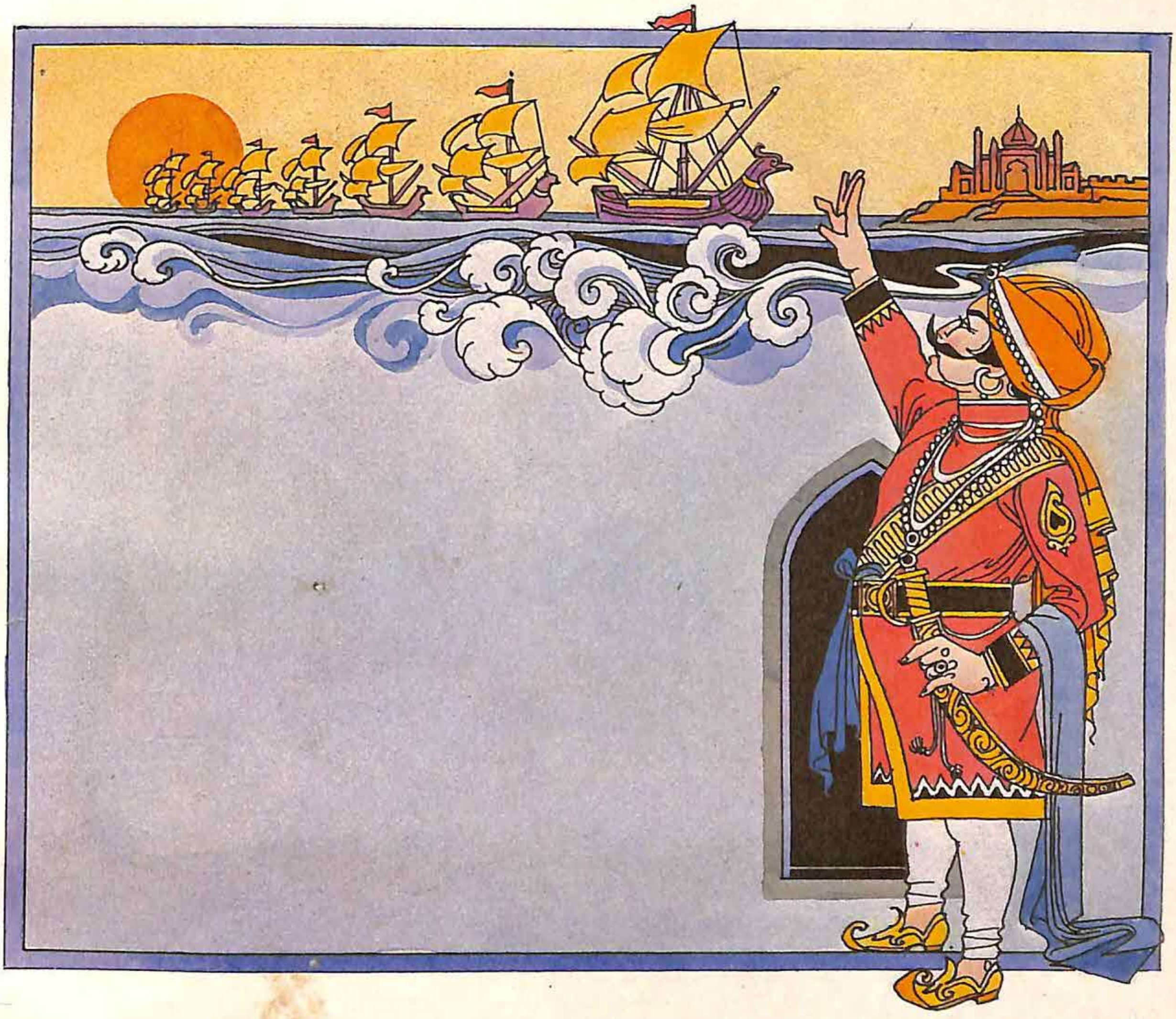
রাজাও জাহাজে চড়ে দুঃখিনী বড়রানীকে ভুলে গেলেন। বিদায়ের দিনে ছোটরানীর সেই হাসি-হাসি মুখ মনে পড়ে আর ভাবেন—এখন রানী কি করছেন ? বোধ হয় চুল বাঁধছেন। এবার রানী কি করছেন ? বুঝি রাঙা পায়ে আলতা পরছেন। এবার রানী সাত মালঞ্চে ফুল তুলছেন, এবার বুঝি সাত মালঞ্চের সাত সাজি ফুলে রানী মালা গাঁথছেন আর আমার কথা ভাবছেন। ভাবতে-ভাবতে বুঝি দুই চক্ষে জল এল, মালা আর গাঁথা হল না। সোনার সুতো, ফুলের সাজি পায়ের কাছে পড়ে রইল ; বসে বসে সারা রাত কেটে গেল, রানীর চক্ষে ঘুম এল না।

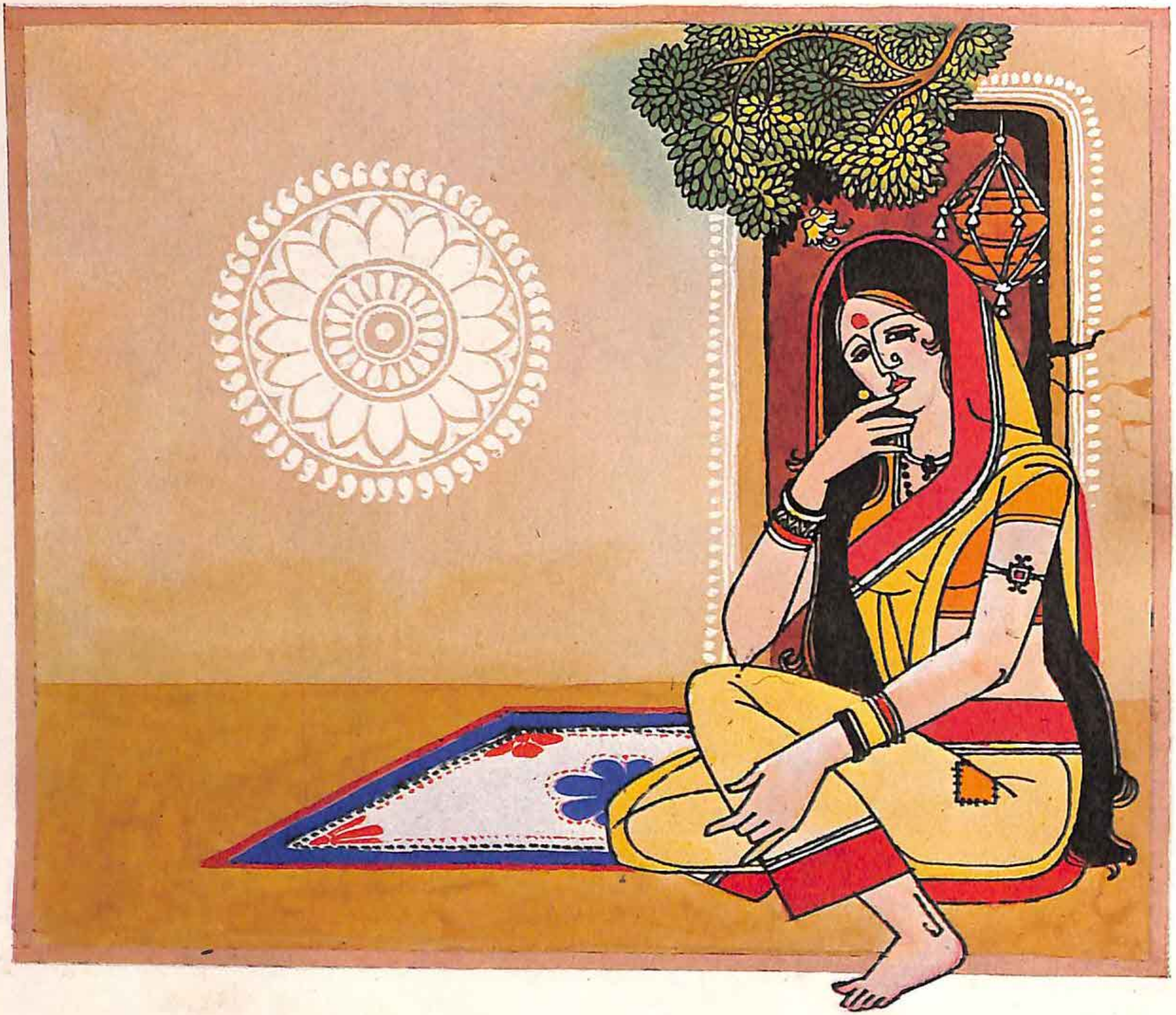
সুওরানী—ছোটরানী রাজার আদরিনী, রাজা তারই কথা ভাবেন। আর বড়রানী রাজার জন্যে পাগল, তাঁর কথা একবার মনেও পড়ে না।

এমনি করে জাহাজে দেশ-বিদেশে রাজার বারো-মাস কেটে গেল।

তেরো-মাসে রাজার জাহাজ মানিকের দেশে এল।

মানিকের দেশে সকলই মানিক। ঘরের দেওয়াল মানিক, ঘাটের সান্ মানিক, পথের কাঁকর মানিক। রাজা সেই মানিকের দেশে সুওরানীর চুড়ি গড়ালেন। আট হাজার মানিকের আটগাছা চুড়ি, পরলে





মনে হয় গায়ের রক্ত ফুটে পড়ছে।

রাজা সেই মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে এলেন। সেই সোনার দেশে স্যাকরার দোকানে নিরেট সোনার দশগাছা মল গড়ালেন। মল জ্বলতে লাগল যেন আগুনের ফিন্‌কি, বাজতে লাগল যেন বীণার ঝঙ্কার—মন্দিরার রিনি-রিনি।

রাজা মানিকের দেশে মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে এলেন।

সে দেশে রাজার বাগানে দুটি পায়রা। তাদের মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, পান্নার গাছে মুক্তোর ফল খেয়ে মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানী সন্ধ্যাবেলা সেই মুক্তোর মালা গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, সকাল বেলায় ফেলে দেন।

দাসীরা সেই বাসি মুক্তোর হার এক জাহাজ রুপো নিয়ে বাজারে বেচে আসে।

রাজা এক জাহাজ রুপো দিয়ে সুওরানীর গলায় দিতে সেই মুক্তোর এক ছড়া হার কিনলেন।

তারপর মানিকের চুড়ি নিয়ে, সোনার দেশে সোনার মল গড়িয়ে, মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর হার গাঁথিয়ে, ছ'মাস পরে রাজা এক দেশে এলেন। সে দেশে রাজকন্যের উপবনে নীল মানিকের গাছে নীল গুটিপোকা নীলকান্ত মণির পাতা খেয়ে, জলের মতো চিকন, বাতাসের মতো ফুরফুরে, আকাশের মতো নীল রেশমের গুটি বাঁধে। রাজার মেয়ে সারা রাত ছাদে বসে, আকাশের সঙ্গে রঙ মিলিয়ে, সেই নীল রেশমে শাড়ি বোনেন। একখানি শাড়ি বুনতে ছ'মাস যায়। রাজকন্যে

একটি দিন সেই আকাশের মতো নীল, বাতাসের মতো ফুরফুরে, জলের মতো চিকন শাড়ি পরে শিবের মন্দিরে মহাদেব নীলকণ্ঠের পূজা করেন। ঘরে এসে শাড়ি ছেড়ে দেন, দাসীরা যার কাছে সাত জাহাজ সোনা পায় তার কাছে শাড়ি বেচে। রাজা সাত জাহাজ সোনা দিয়ে আদরিনী সুওরানীর শখের শাড়ি কিনে নিলেন।

তারপর আর ছ'মাসে রাজার সাতখানা জাহাজ সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে ছোটরানীর মানিকের চুড়ি, সোনার মল, মুক্তোর মালা, সাধের শাড়ি নিয়ে দেশে এল। তখন রাজার মনে পড়ল বড়রানী বাঁদর চেয়েছেন।

রাজা মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রীবর, বড় ভুল হয়েছে। বড়রানীর বাঁদর আনা হয়নি, তুমি একটা বাঁদরের সন্ধানে যাও।

রাজমন্ত্রী একটা বাঁদরের সন্ধানে চলে গেলেন। আর রাজা শ্বেতহস্তী চড়ে, লোকারণ্য রাজপথ দিয়ে, ছোটরানীর সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে অন্তঃপুরে চলে গেলেন।

ছোটরানী সাত-মহল বাড়ির সাত-তলার উপরে সোনার আয়না সামনে রেখে সোনার কাঁকুইয়ে চুল চিরে, সোনার কাঁটা সোনার দড়ি দিয়ে খোঁপা বেঁধে সোনার চেয়াড়িতে সিঁদুর নিয়ে ভুরুর মাঝে টিপ পরছেন, কাজল-লতায় কাজল পেড়ে চোখের পাতায় কাজল পরছেন, রাঙা পায়ে আলতা দিচ্ছেন, সখীরা ফুলের থালা নিয়ে, পানের বাটা নিয়ে রাজরানী ছোটরানীর সেবা করছে—রাজা সেখানে এলেন।

স্ফটিকের সিংহাসনে রানীর পাশে বসে বললেন—এই নাও, রানী! মানিকের দেশে মানিকের ঘাট, মানিকের বাট—সেখান থেকে হাতের

চুড়ি এনেছি। সোনার দেশে সোনার ধুলো, সোনার বালি—সেখান থেকে পায়ের মল এনেছি। মুক্তোর রাজ্যে মুক্তোর পা, মানিকের ঠোঁট, দুটি পাখি মুক্তোর ডিম পাড়ে। দেশের রানী সেই মুক্তোর হার গাঁথেন, রাতের বেলায় খোঁপায় পরেন, ভোরের বেলায় ফেলে দেন। রানী, তোমার জন্যে সেই মুক্তোর হার এনেছি। রানী, এক দেশে রাজার মেয়ে এক-খী রেশমে সাত-খী সুতো কেটে নিশুতি রাতে ছাদে বসে ছ'টি মাসে একখানি শাড়ি বোনেন, এক দিন পরে পুজো করেন, ঘরে এসে ছেড়ে দেন। রানী, আমি সেই রাজার মেয়ের দেশ থেকে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে রাজকন্যার হাতে বোনা শাড়ি এনেছি। তুমি একবার চেয়ে দেখ ! পৃথিবী খুঁজে গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, একবার পরে দেখ !

রানী তখন দু'হাতে আটগাছা চুড়ি পরলেন ; মানিকের চুড়ি রানীর হাতে ঢিলে হল, হাতের চুড়ি কাঁধে উঠল।

রানী তখন দু' পায়ে দশ গাছা মল পরলেন ; রাঙা পায়ে সোনার মল আল্‌গা হল; দু-পা যেতে দশ-গাছা মল সানের উপর খসে পড়ল। রানী মুখ ভার করে মুক্তোর হার গলায় পরলেন ; মুক্তোর দেশের মুক্তোর হার রানীর গলায় খাটো হল, হার পরতে গলার মাস কেটে গেল। রানী ব্যথা পেলেন !

সাত-পুরু করে শখের শাড়ি অঙ্গে পরলেন ; নীল রেশমের নীল শাড়ি হাতে-বহরে কম পড়ল। রানীর চোখে জল এল।

তখন মানিনী ছোটরানী আট-হাজার মানিকের আট-গাছা চুড়ি খুলে ফেলে, নিরেট সোনার দশ-গাছা মল পায়ে ঠেলে, মুক্তোর মালা, শখের

শাড়ি ধুলোয় ফেলে, বললেন—ছাই গহনা ! ছাই এ-শাড়ি ! কোন পথের কাঁকর কুড়িয়ে এ-চুড়ি গড়ালে ? মহারাজ, কোন দেশের ধুলো বালিতে এ-মল গড়ালে ? ছি ছি, এ কার বাসি মুক্তোর বাসি হার ! এ কোন রাজকন্যার পরা শাড়ি ! দেখলে যে ঘৃণা আসে, পরতে যে লজ্জা হয় ! নিয়ে যাও মহারাজ, এ পরা-শাড়ি পরা-গহনায় আমার কাজ নেই ।

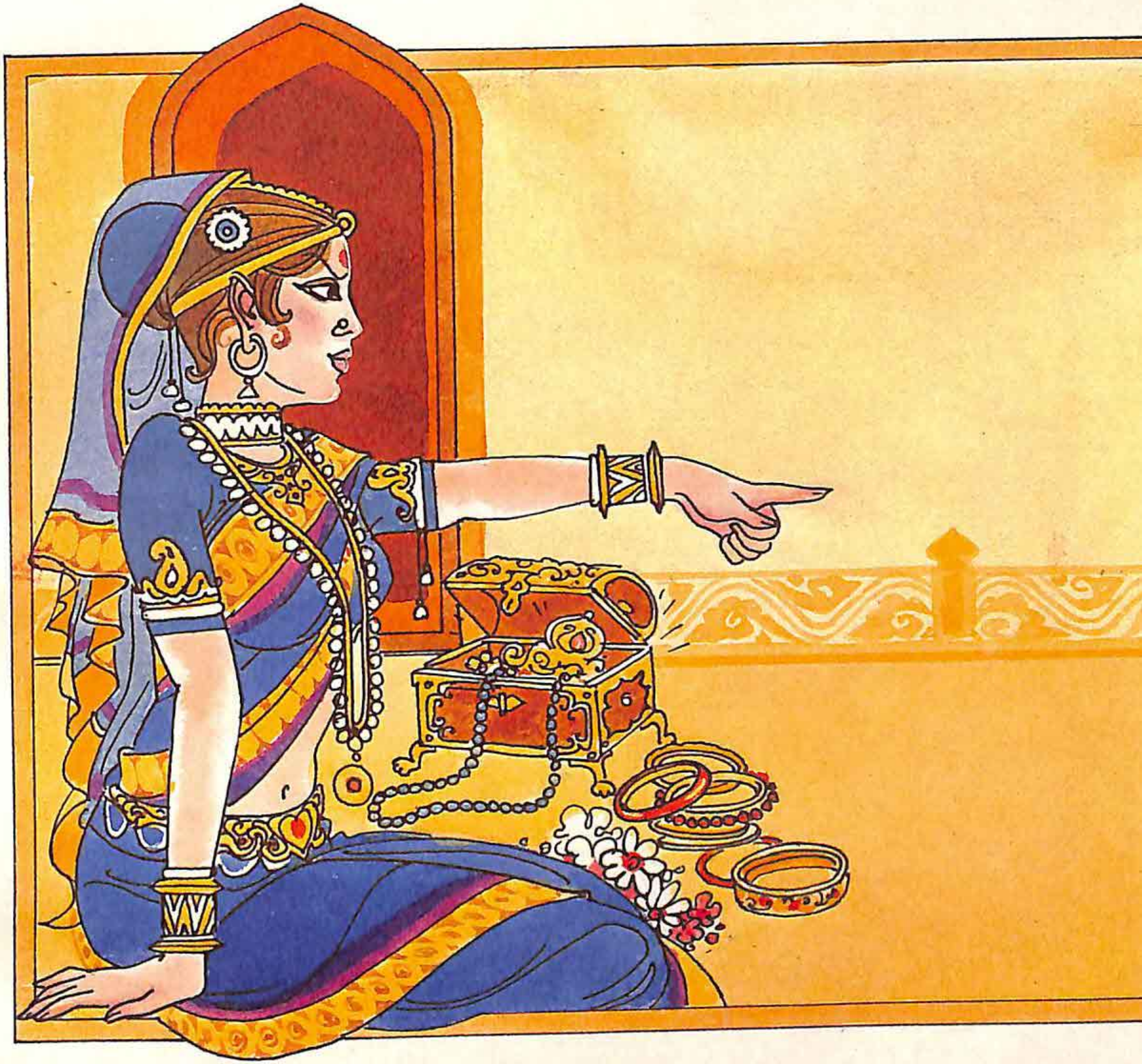
রানী অভিমানে গোসা-ঘরে খিল দিলেন । আর রাজা মলিন-মুখে সাত জাহাজ সোনা দিয়ে কেনা সেই সাধের গহনা, শখের শাড়ি নিয়ে রাজসভায় এলেন ।

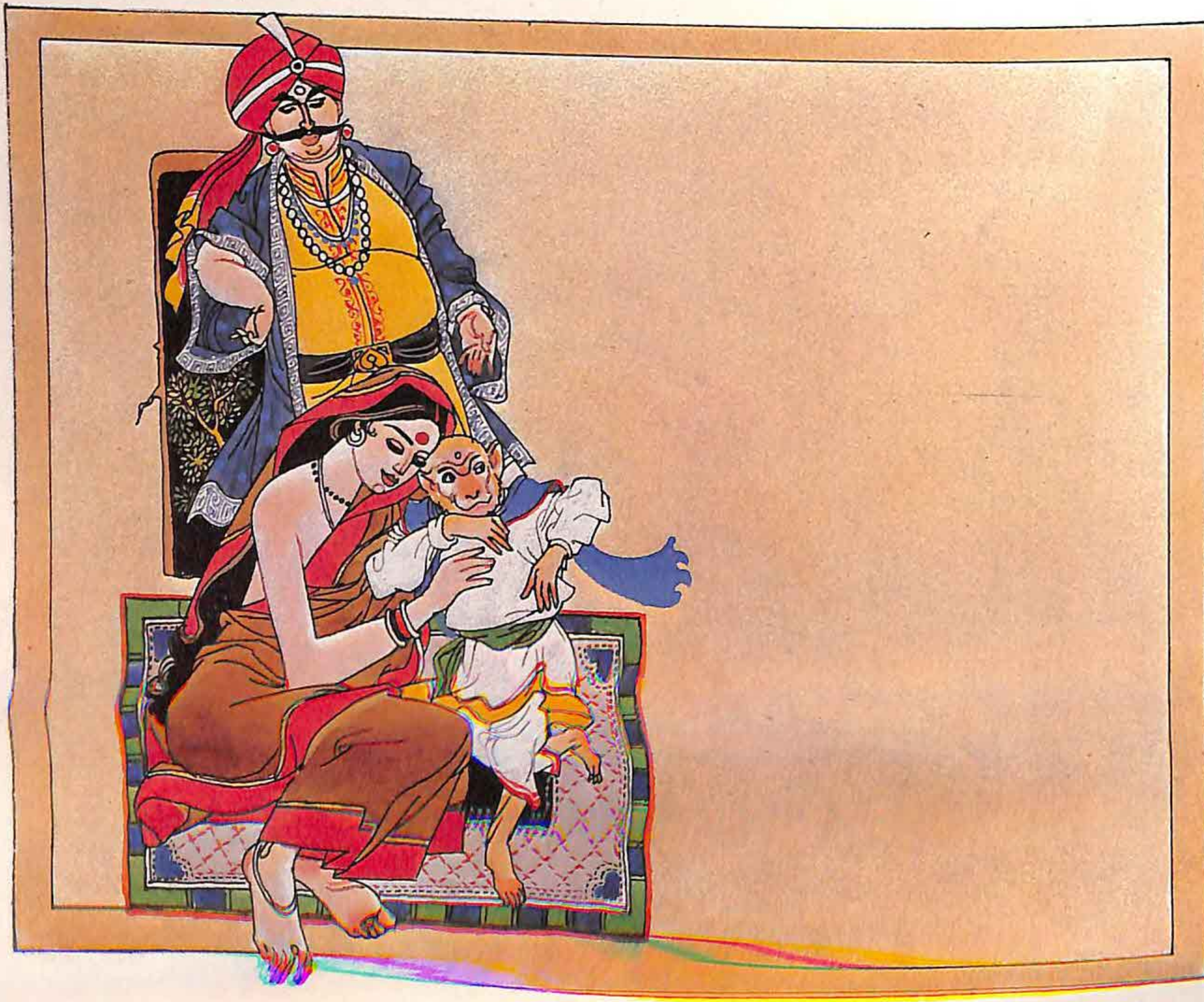
রাজমন্ত্রী রাজসিংহাসনের এক পাশে, রাজ্যের মাঠ-ঘাট দোকান-পাট সন্ধান করে, যাদুকরের দেশের এক বণিকের জাহাজ থেকে কানা-কড়ি দিয়ে একটি বাঁদরছানা কিনে বসে আছেন ।

রাজা এসে বললেন—মন্ত্রীবর, আশ্চর্য হলুম ! মাপ দিয়ে ছোটরানীর গায়ের গহনা, পরনের শাড়ি আনলুম, সে-শাড়ি, সে-গহনা রানীর গায়ে হল না !

তখন সেই বনের বানর রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—বড় ভাগ্যবতী পুণ্যবতী না হলে দেবকন্যের হাতে বোনা, নাগকন্যের হাতে গাঁথা, মায়া-রাজ্যের এ মায়া-গহনা, মায়া-শাড়ি পরতে পারে না । মহারাজ, রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ, যাকে বৌ করবে তাকে পরতে দিও ।

বানরের কথায় রাজা অবাক হলেন । হাসতে হাসতে মন্ত্রীকে বললেন—মন্ত্রী, বানরটা বলে কি ? ছেলেই হল না বৌ আনব কেমন করে ? মন্ত্রী, তুমি স্যাকরার দোকানে ছোটরানীর নতুন গহনা গড়তে





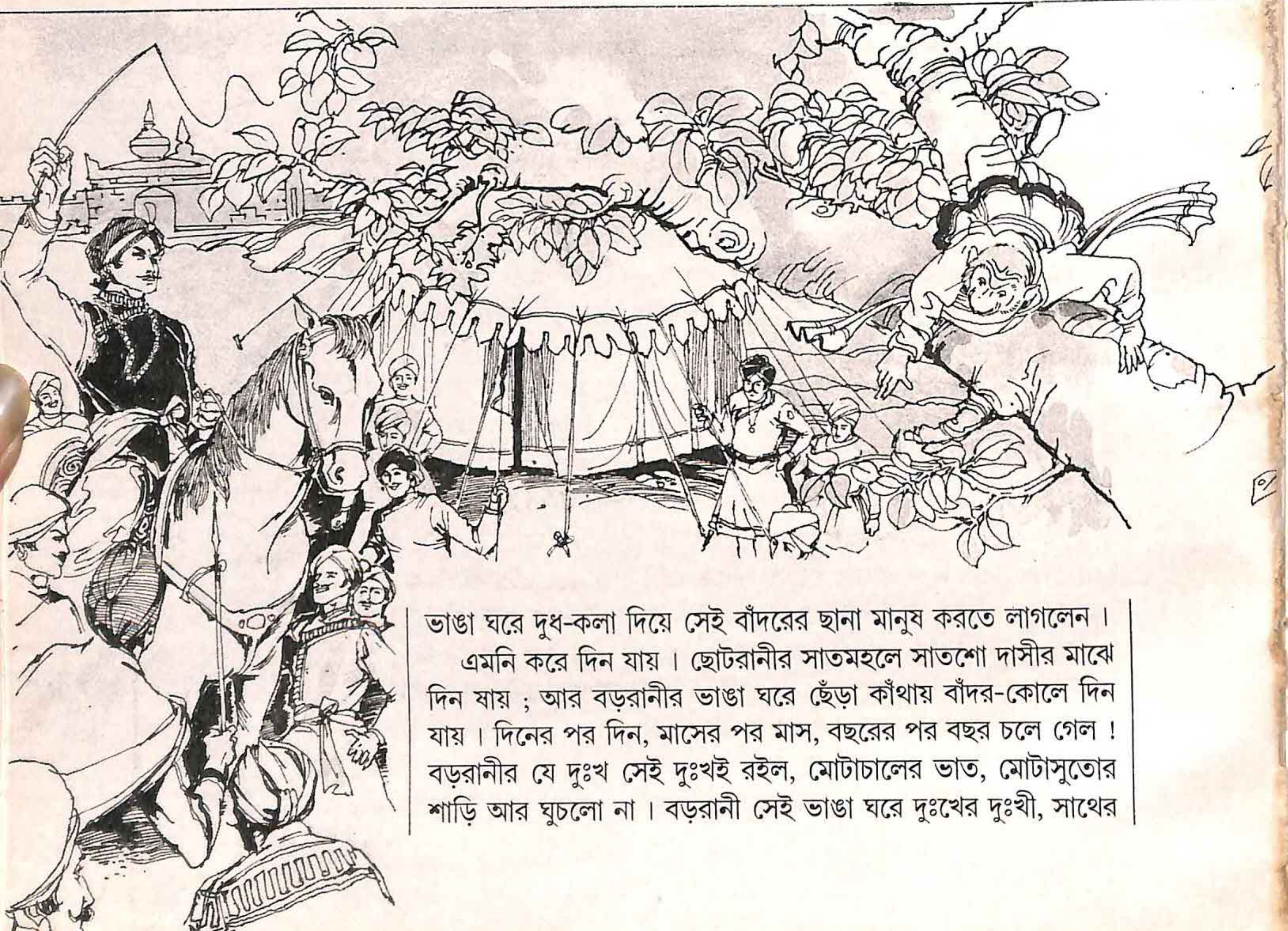
দাওগে, তাঁতির তাঁতে রানীর নতুন শাড়ি বুনতে দাওগে। এ-গহনা, এ-শাড়ি রাজভাণ্ডারে তুলে রাখ ; যদি বৌ ঘরে আনি তাকে পরতে দেব।

রাজমন্ত্রী স্যাকরার দোকানে ছোটরানীর নতুন গহনা গড়াতে গেলেন। আর রাজা সেই বাঁদর-কোলে বড়রানীর কাছে গেলেন।

দুঃখিনী বড়রানী, জীর্ণ আঁচলে পা মুছিয়ে, ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় রাজাকে বসতে দিয়ে কাঁদতে-কাঁদতে বললেন—মহারাজ, বোসো। আমার এই ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বোসো। আমার আর কি আছে তোমায় বসতে দেব ? হায়, মহারাজ, কতদিন পরে তুমি ফিরে এলে, আমি এমনি অভাগিনী তোমার জন্যে ছেঁড়া কাঁথা পেতে দিলুম।

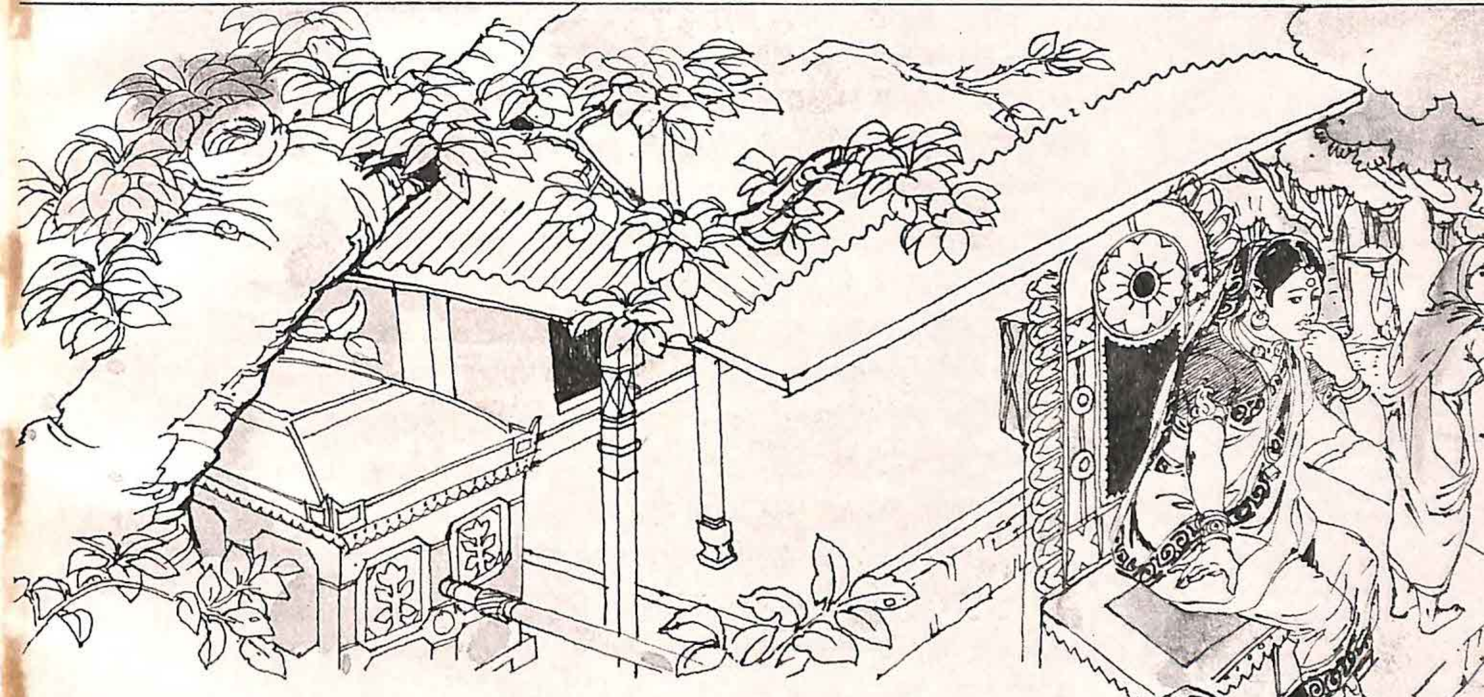
রানীর কথায় রাজার চোখে জল এল। ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বসে বড়রানীর কোলে বাঁদর-ছানা দিয়ে বললেন—মহারানী, তোমার এ ছেঁড়া কাঁথা ভাঙা ঘর, ছোটরানীর সোনার সিংহাসন, সোনার ঘরের চেয়ে লক্ষ গুণে ভালো। তোমার এ-ভাঙা ঘরে আদর আছে, যত্ন আছে, দুটো মিষ্টি কথা আছে, সেখানে তা তো নেই। রানী, সাত জাহাজ সোনা দিয়ে গায়ের গহনা, পরনে শাড়ি দিয়েছি, ছোটরানী পায়ে ঠেলেছে ; আর কানা-কড়ি দিয়ে তোমার বাঁদর এনেছি, তুমি আদর করে কোলে নিয়েছ। রানী, আমি আর তোমায় দুঃখ দেব না। এখন বিদায় দাও, আমি আবার আসব রানী। কিন্তু দেখো, ছোটরানী যেন জানতে না পারে ! তোমার কাছে এসেছি শুনলে আর রক্ষে রাখবে না ! হয় তোমায়, নয়তো আমায় বিষ খাওয়াবে।

রাজা বড়রানীকে প্রবোধ দিয়ে চলে গেলেন। আর বড়রানী সেই



ভাঙা ঘরে দুধ-কলা দিয়ে সেই বাঁদরের ছানা মানুষ করতে লাগলেন।

এমনি করে দিন যায়। ছোটরানীর সাতমহলে সাতশো দাসীর মাঝে দিন যায় ; আর বড়রানীর ভাঙা ঘরে ছেঁড়া কাঁথায় বাঁদর-কোলে দিন যায়। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর চলে গেল ! বড়রানীর যে দুঃখ সেই দুঃখই রইল, মোটাচালের ভাত, মোটাসুতোর শাড়ি আর ঘুচলো না। বড়রানী সেই ভাঙা ঘরে দুঃখের দুঃখী, সাথের



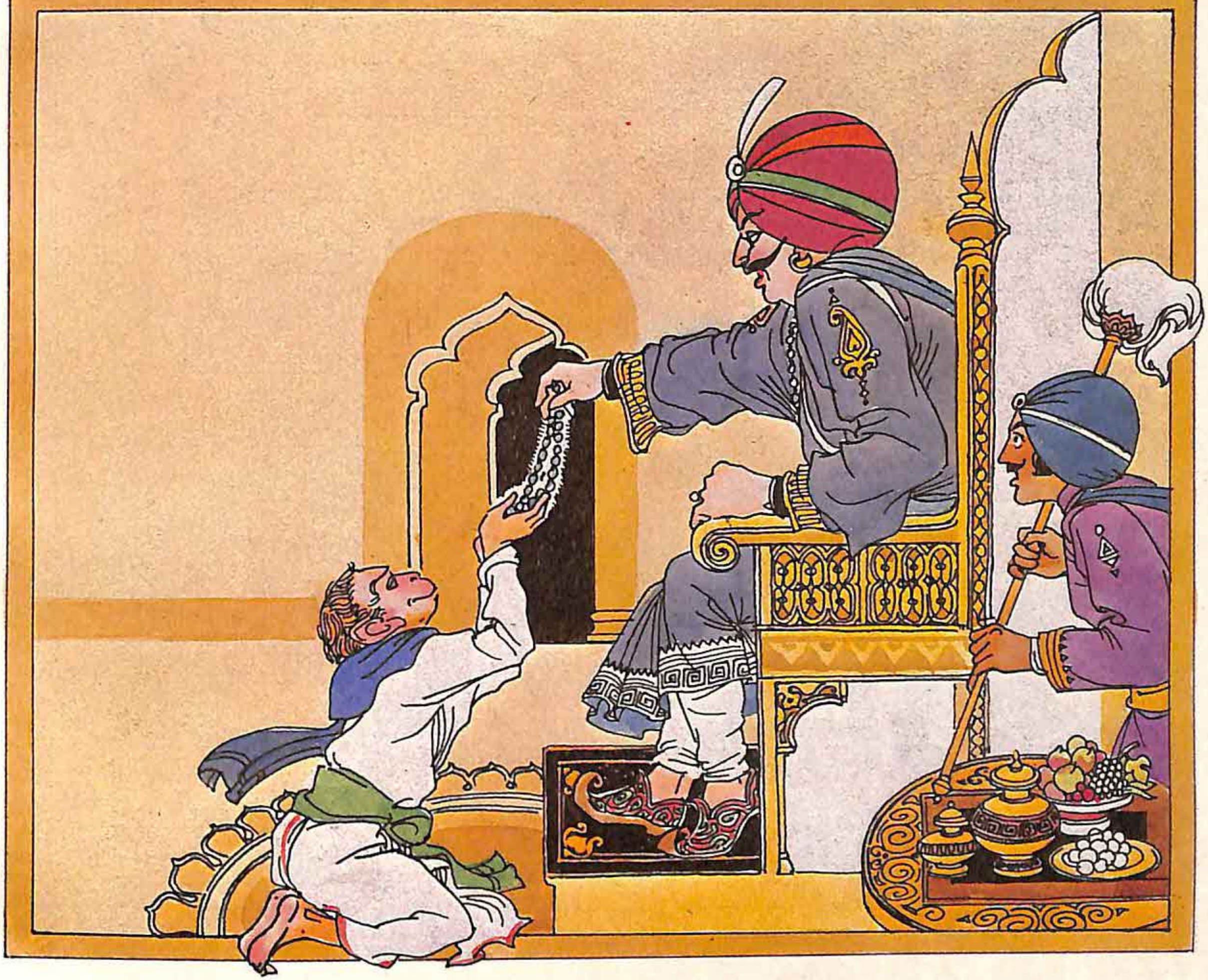
সাথী বনের বানরকে কোলে নিয়ে ছোটরানীর সাতমহল বাড়ি, সাতখানা ফুলের বাগানের দিকে চেয়ে চেয়ে কাঁদেন। বানর বড়রানীকে যখন দেখে তখনি রানীর চোখে জল, একটি দিন হাসতে দেখে না।

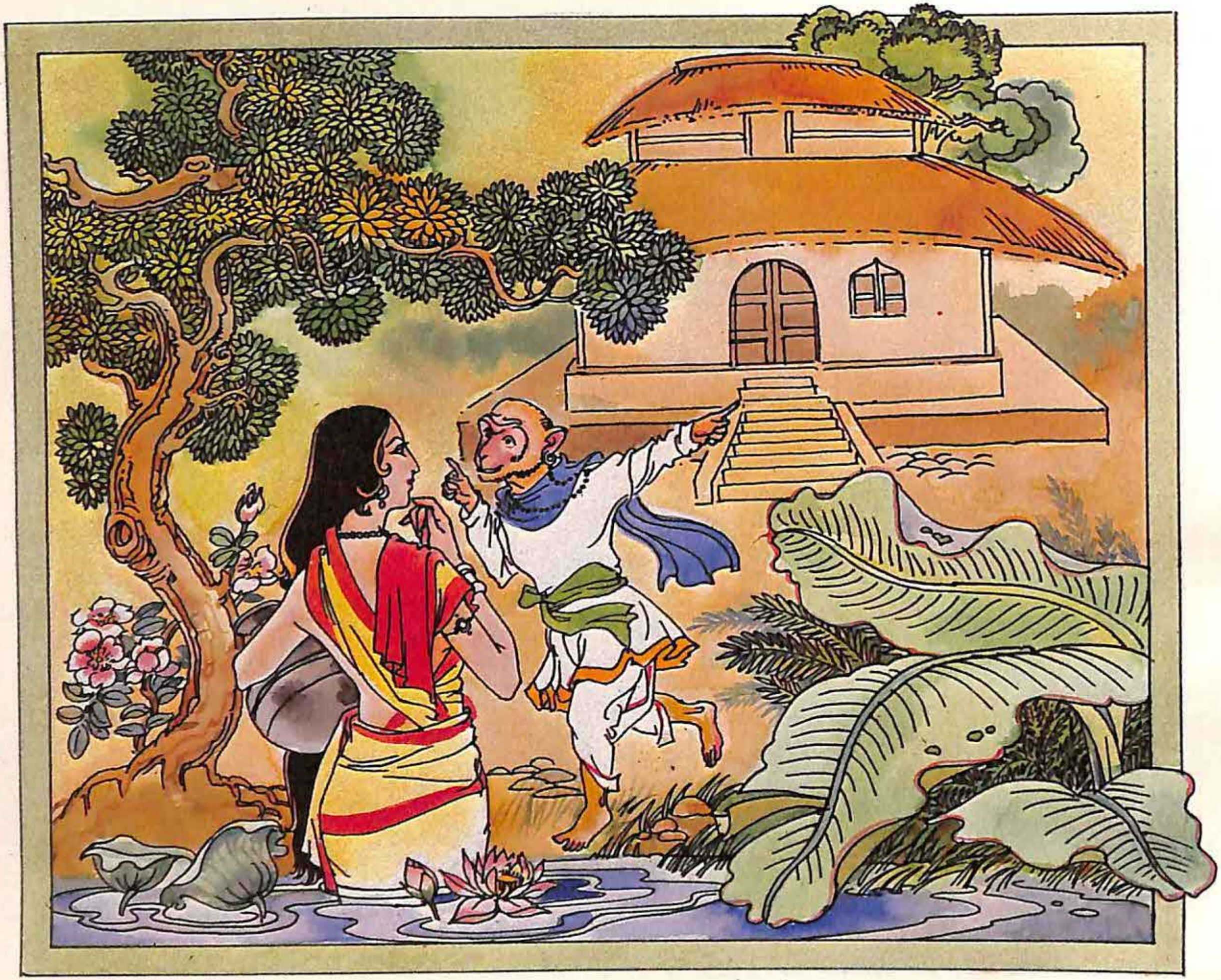
একদিন বানর বললে—হ্যাঁ মা, তুই কাঁদিস কেন ? তোর কিসের দুঃখ ? রাজবাড়ির দিকে চেয়ে চেয়ে কেন কাঁদিস, মা ? ওখানে তোর কে আছে ?



রানী বললেন—ওরে বাছা, ওখানে আমার সব আছে। আমার সাতমহল বাড়ি আছে, সাতশো দাসী আছে, সাত সিন্দুক গহনা আছে, সাতখানা মালঞ্চ আছে। আর বাছা, ওই সাতমহল বাড়িতে রাজার ছোটরানী আমার এক সতীন আছে। সেই রাক্ষসী আমার রাজাকে যাদু করে আমার সাতমহল বাড়ি, সাতশো দাসী, সাত সিন্দুক গহনা কেড়ে নিয়ে ওই ফুলের মালঞ্চে সোনার মন্দিরে সুখে আছে ; আমার সর্বস্বধন রাজাকে নিয়ে আমায় পথের কাঙালিনী করেছে। ওরে বাছা, আমার কিসের দুঃখ ! আমি রাজার মেয়ে ছিলুম, রাজার বৌ হলুম, সাতশো দাসী পেলুম, সাতমহল বাড়ি পেলুম, মনের মতো রাজস্বামী পেলুম। সব পেলুম তবু কে জানে কার অভিশাপে, চিরদিনে পেলুম না কেবল রাজার কোলে দিতে সোনারচাঁদ রাজপুত্র ! হায়, কত জন্মে কত পাপ করেছি, কত লোকের কত সাধে বাধ সেধেছি, কত মায়ের প্রাণে ব্যথা দিয়েছি, তাই এজন্মে সোনার সংসার সতীনকে দিয়ে, রানীর গরবে, স্বামীর সোহাগে, রাজপুত্রের আশায় ছাই দিয়ে পথের কাঙালিনী হয়েছি ! বাছারে, বড় পাষাণী তাই এতদিন এত অপমান, এত যন্ত্রণা বুকে সয়ে বেঁচে আছি !

দুঃখের কথা বলতে-বলতে রানীর চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল। তখন সেই বনের বানর রানীর কোলে উঠে বসে, চোখের জল মুছে দিয়ে রানীকে বললে—মা, তুই কাঁদিসনে। আমি তোর দুঃখ ঘোচাবো, তোর সাতমহল বাড়ি দেবো, সাতখানা মালঞ্চ দেবো, সাতশো দাসী ফিরে দেবো, তোকে সোনার মন্দিরে রাজার পাশে রানী করে কোলে নিতে সোনারচাঁদ ছেলে দেবো তবে আমার নাম বাঁদর। আমি যা বলি





যদি তা করতে পারিস তবে তোর রাজবাড়িতে যেমন ঐশ্বর্য যেমন আদর ছিল তেমনি হবে।

বানরের কথায় রানীর চোখের কোণে জল, ঠোঁটের কোণে হাসি এল। রানী কেঁদে-কেঁদে হেসে বললেন—ওরে বাছা, দেবতার মন্দিরে কত বলি দিয়েছি, তীর্থে-তীর্থে কত না পুজো দিয়েছি, তবু একটি রাজপুত্র কোলে পাইনি। তুই কি তপস্যা করে কোন্ দেবতার বরে, বনের বানর হয়ে আমাকে রাজরানী করে রাজপুত্র কোলে এনে দিবি ? বাছা থাক্, আমার রাজা সুখে থাক্, আমার সতীন সুখে থাক্, আমার যে দুঃখ সেই দুঃখই থাক্, তোর এ অসাধ্য-সাধনে কাজ নেই। রাত হল তুই ঘুম যা।

বানর বললে—না মা, আমার কথা না-শুনলে ঘুম যাব না।

রানী বললেন—ওরে তুই ঘুমো, রাত যে অনেক হল ! পুব-পশ্চিমে মেঘ উঠল, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি এল, রাজ্য জুড়ে ঘুম এল, তুই আমার ঘুমো। কাল যা বলবি তাই শুনব, আজ তুই ঘুম যা। ভাঙা ঘরে দ্বার দিয়েছি—ঝড় উঠেছে, ঘরের মাঝে কাঁথা পেতেছি—শীত লেগেছে, তুই দুধের বাছা, আমার কোলে, বুকের কাছে ঘুম যা।

বানর রানীর বুকে মাথা রেখে ঘুম গেল। রানী ছেঁড়া কাঁথায় মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন।

এমনি করে রাত কাটল। ছোটরানীর সোনার পালঙ্কে ফুলের বিছানায়, রাজার পাশে রাত কাটল ; আর বড়রানীর জলে ঝড়ে, ভাঙা ঘরে, ছেঁড়া কাঁথায় রাত কাটল।

সকাল হল। রাজবাড়িতে প্রহরীখানায় প্রহর বাজল, নাকরাখানায়

নবৎ বাজল, রাজারানীর ঘুম ভাঙল।

রাজা সোনার ভৃঙ্গারে স্ফটিকজলে মুখ ধুয়ে, রাজবেশ অঙ্গে পরে রাজ-দরবারে নেবে গেলেন—আর ছোটরানী সোনার পালঙ্কে, ফুলের বিছানায়, ফুলের পাখায় হাওয়া খেতে খেতে পাশ ফিরে ঘুম গেলেন।

আর বড়রানী কি করলেন ?

ভাঙা ঘরে সোনার রোদ মুখে পড়ল, রানী উঠে বসলেন। এদিক দেখলেন ওদিক দেখলেন, এপাশ দেখলেন ওপাশ দেখলেন—বানর নেই ! রানী এ-ঘর খুঁজলেন ও-ঘর খুঁজলেন, ঘরের চাল খুঁজলেন, গাছের ডাল খুঁজলেন—বানর নেই ! বড়রানী কাঁদতে লাগলেন।

বানর কোথা গেল ?

বানর ভাঙা ঘরে ঘুমন্ত রানীকে একলা রেখে রাত না-পোহাতে রাজ-দরবারে চলে গেল।

রাজা বার দিয়ে দরবারে বসেছেন। চারিদিকে সভাসদ মন্ত্রী, দুয়ারে সিপাই-সান্ত্রী, আশেপাশে লোকের ভিড়। রানীর বানর সেই লোকের ভিড় ঠেলে, সিপাই-সান্ত্রীর হাত এড়িয়ে, রাজার পায়ে প্রণাম করে বললে—মহারাজ, বড় সুখবর এনেছি, মায়ের আমার ছেলে হবে।

রাজা বললেন—ওরে বানর বলিস কি ? একথা কি সত্য ? বড়রানী দুওরানী, তার ছেলে হবে ? দেখিস্ এ-কথা যদি মিথ্যা হয় তো তোকেও কাটব আর তোর মা দুওরানীকেও কাটব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা আমার। এখন আমায় খুশি কর, আমি বিদায় হই।

রাজা গলার গজমোতি হার খুলে দিয়ে বানরকে বিদায় করলেন।

বানর নাচতে নাচতে—ভাঙা ঘরে দুওরানী পড়ে-পড়ে কাঁদছেন—সেখানে গেল।

দুওরানীর চোখের জল, গায়ের ধুলো মুছিয়ে বানর বললে—এই দেখ্ মা, তোর জন্যে কি এনেছি ! তুই রাজার রানী, গলায় দিতে হার পাসনে, কাঠের মালা কিনে পরিস, এই মুক্তোর মালা পর !

রানী বানরের হাতে গজমোতি হার দেখে বললেন—এই হার তুই কোথা পেলি ? এ যে রাজার গলার গজমোতি হার ! যখন রানী ছিলুম রাজার জন্যে গেঁথেছিলুম, তুই এ-হার কোথায় পেলি ? বল্ বানর, রাজা কি এ-হার ফেলে দিয়েছেন, রাজপথে কুড়িয়ে পেলি ?

বানর বললে —না মা, কুড়িয়ে পাইনি। তোর হাতে গাঁথা রাজার গলার গজমোতি হার কুড়িয়ে কি পাওয়া যায় ?

রানী বললেন—তবে কি রাজার ঘরে চুরি করলি ?

বানর বললে—ছি ছি মা, চুরি কি করতে আছে ! আজ রাজাকে সু-খবর দিয়েছি তাই রাজা হার দিয়ে খুশি করেছেন।

রানী বললেন—ওরে বাছা, তুই যে দুঃখীর সন্তান, বনের বানর। ভাঙা ঘরে দুঃখিনীর কোলে শুয়ে, রাজাকে দিতে কি সুখের সন্ধান পেলি যে রাত না-পোয়াতে রাজবাড়িতে ছুটে গেলি !

বানর বললে—মা আমি স্বপ্ন পেয়েছি আমার যেন ভাই হয়েছে, তোর কোলে খোকা হয়েছে ; সেই খোকা যেন রাজসিংহাসনে রাজা হয়েছে। তাই ছুটে রাজাকে খবর দিলুম—রাজামহাশয়, মায়ের খোকা হবে। তাইতো রাজা খুশি হয়ে গলার হার খুলে দিলেন।

রানী বললেন—ওরে, রাজা আজ শুনলেন ছেলে হবে, কাল

শুনবেন মিছে কথা ! আজ রাজা গলায় দিতে হার দিলেন,কাল যে মাথা নিতে হুকুম দেবেন। হায় হায়, কি করলি ? একমুঠো খেতে পাই, একপাশে পড়ে থাকি, তবু বছর গেলে রাজার দেখা পাই, তুই আমার তাও ঘোচালি ? ওরে তুই কি সর্বনাশ করলি ? মিছে খবর কেন রটালি ? এ জঞ্জাল কেন ঘটালি !

বানর বললে—মা তোর ভয় কি, ভাবিস কেন ? এ দশমাস চুপ করে থাক। সবাই জানুক—বড়রানীর ছেলে হবে। তারপর রাজা যখন ছেলে দেখবেন তখন তোর কোলে সোনারচাঁদ ছেল দেব, তুই রাজাকে দেখাস। এখন চল, বেলা হল, খিদে পেয়েছে।

রানী বললেন—চল্ বাছা চল্। বাটি পুরে জল রেখেছি, গাছের ফল এনেছি, খাবি চল।

রানী ভাঙা পিঁড়েয় বানরকে খাওয়াতে বসলেন।

আর রাজা ছোটরানীর ঘরে গেলেন।

ছোটরানী কুস্বপ্ন দেখে জেগে উঠে সোনার পালঙ্কে বসে-বসে ভাবছেন এমন সময় রাজা এসে খবর দিলেন—আরে শুনেছ ছোটরানী, বড়রানীর ছেলে হবে ! বড় ভাবনা ছিল রাজসিংহাসন কাকে দেব, এতদিনে সে ভাবনা ঘুচল ! যদি ছেলে হয় তাকে রাজা করব, আর যদি মেয়ে হয়, তবে তার বিয়ে দিয়ে জামাইকে রাজ্য দেব। রানী, বড় ভাবনা ছিল, এতদিনে নিশ্চিন্ত হলুম।

রানী বললেন—পারিনে বাপু, আপনার জ্বালায় বাঁচিনে, পরের ভাবনা !

রাজা বললেন—সে কি রানী ? এমন সুখের দিনে এমন কথা বলতে



হয় ? রাজপুত্র কোলে পাব, রাজসিংহাসনে রাজা করব, একথা শুনে মুখ-ভার করে ? রানী, রাজবাড়িতে সবার মুখে হাসি, তুমি কেন অকল্যাণ কর ?

রানী বললেন—আর পারিনে ! কার ছেলে রাজা হবে, কার মেয়ে রাজ্য পাবে, কে সিংহাসনে বসবে, এত ভাবনা ভাবতে পারিনে। নিজের জ্বালায় মরি, পরের ছেলে মোলো বাঁচলো তার খবর রাখিনে। বাবারে, সকালবেল্লা বকে-বকে ঘুম হল না, মাথা ধরল, যাই নেয়ে আসি।

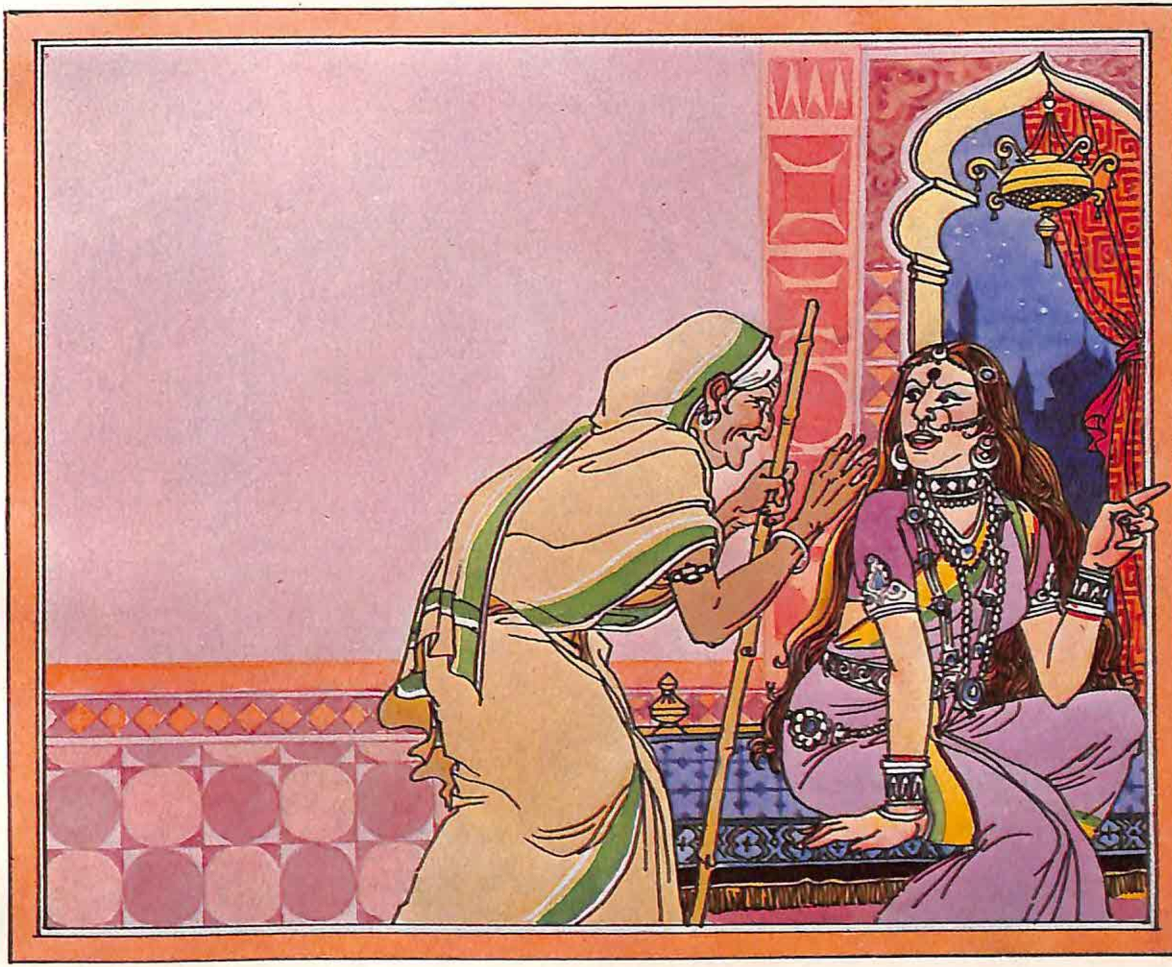
রাগভরে ছোটরানী আটগাছা চুড়ি, দশগাছা মল ঝমঝমিয়ে একদিকে চলে গেলেন।

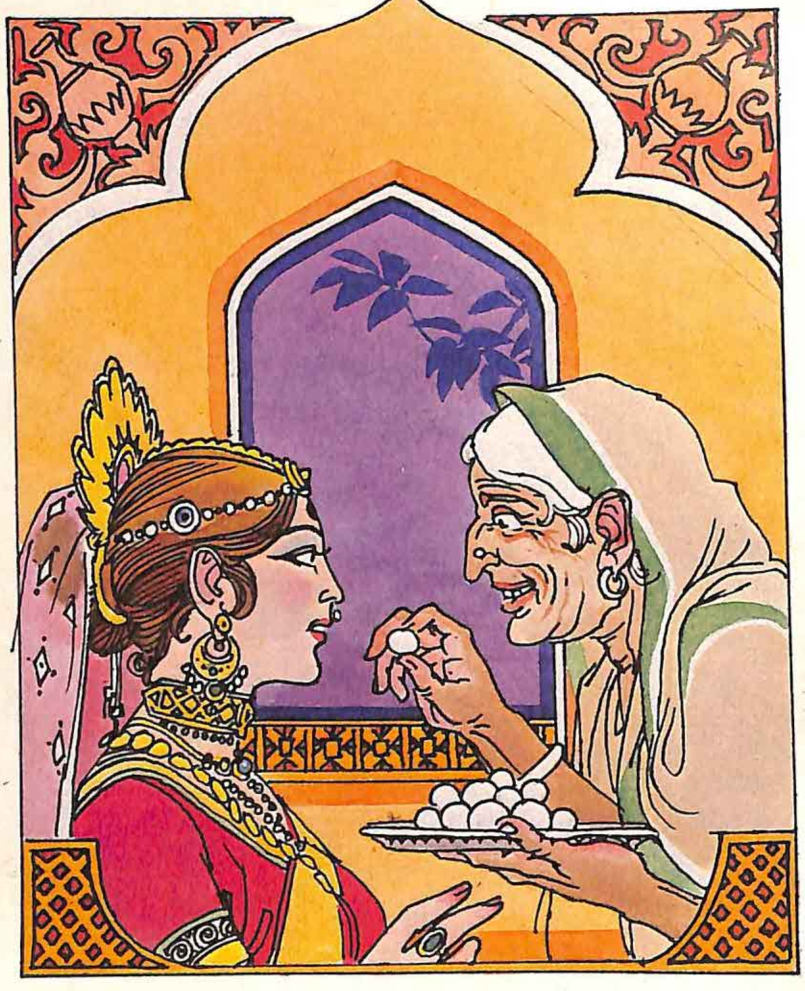
রাজার বড় রাগ হল। রাজকুমারকে ছোটরানী মর্ বললে। রাজা মুখ আঁধার করে বার-মহলে চলে এলেন। রাজা-রানীতে ঝগড়া হল। রাজা আর ছোটরানীর মুখ দেখলেন না, বড়রানীর ঘরেও গেলেন না—ছোটরানী শুনে যদি বিষ খাওয়ায়, বড়রানীকে প্রাণে মারে ! রাজা বার-মহলে একলা রইলেন।

একমাস গেল, দুমাস গেল, দুমাস গিয়ে তিনমাস গেল, রাজা-রানীর ভাব হল না। ঝগড়ায়-ঝগড়ায় চার মাস কাটল। পাঁচ মাসে দুওরানীর পোষা বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে। রাজা বললেন—কি হে বানর, খবর কি ?

বানর বললে—মহারাজ, মায়ের বড় দুঃখ ! মোটা চালের ভাত মুখে রোচে না, মা আমার না খেয়ে কাহিল হলেন।

রাজা বললেন—একথা তো আমি জানিনে। মন্ত্রীবর, যাও এখনি





সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন, সোনার থালে সোনার বাটিতে বড়রানীকে পাঠিয়ে দাও। আজ থেকে আমি যা খাই বড়রানীও তাই খাবেন। যাও মন্ত্রী, বানরকে হাজার মোহর দিয়ে বিদায় কর।

মন্ত্রী বানরকে বিদায় করে রান্নাঘরে গেলেন। আর রানীর বানর মোহরের তোড়া নিয়ে রানীর কাছে এল।

রানী বললেন—আজ আবার কোথা ছিলি? এতখানি বেলা হল নাইতে পেলুম না, রাঁধবো কখন? খাব কখন?

বানর বললে—মা, আর তোকে রাঁধতে হবে না। রাজবাড়ি থেকে সোনার থালায় সোনার বাটিতে সরু চালের ভাত, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন আসবে, তাড়াতাড়ি নেয়ে আয়।

রানী নাইতে গেলেন। বানর একমুঠো মোহর নিয়ে বাজারে গেল। ষোলো থান মোহরে ষোলোজন ঘরামি নিলে, ষোলো গাড়ি খড় নিলে, ষোলোশো বাঁশ নিলে। সেই ষোলোশো বাঁশ দিয়ে, ষোলো গাড়ি খড় দিয়ে, ষোলোজন ঘরামি খাটিয়ে, চক্ষের নিমেষে দুওরানীর বানর ভাঙাঘর নতুন করলে। শোবার ঘরে নতুন কাঁথা পাতলে, খাবার ঘরে নতুন পিঁড়ি পাতলে, রাজবাড়ির ষোলো বামুনে রানীর ভাত নিয়ে এল; ষোলো মোহর বিদায় পেলে!

দুওরানী নেয়ে এলেন। এসে দেখলেন—নতুন ঘর। ঘরের চাল নতুন! চালের খড় নতুন! মেঝেয় নতুন কাঁথা! আল্‌নায় নতুন শাড়ি! রানী অবাক হলেন। বানরকে বললেন—বাছা, ভাঙা ঘর দেখে ঘাটে গেলুম, এসে দেখি নতুন ঘর! কেমন করে হল?

বানর বললে—মা, রাজা-মশায় মোহর দিয়েছেন। সেই মোহরে

ভাঙা ঘর নতুন করেছি, ছেঁড়া কাঁথা নতুন করেছি, নতুন পিঁড়ে পেতেছি, তুই সোনার থালে গরম ভাত, সোনার বাটিতে তপ্ত দুধ খাবি চল্ ।

রানী খেতে বসলেন । কতদিন পরে সোনার থালায় ভাত খেলেন, সোনার ঘটিতে মুখ ধুলেন, সোনার বাটায় পান খেলেন, তবু মনে সুখ পেলেন না । রানী রাজভোগ খান আর ভাবেন—আজ রাজা সোনার থালে ভাত পাঠালেন, কাল হয়তো মশানে নিয়ে মাথা কাটবেন ।

এমনি করে ভয়ে-ভয়ে এক মাস, দুমাস, তিন মাস গেল । বড়রানীর নতুন ঘর পুরোনো হল, ঘরের চাল ফুটো হল, চালের খড় উড়ে গেল । বানর রাজার সঙ্গে দেখা করলে ।

রাজা বললেন—কি বানর, কি মনে করে ?

বানর বললে—মহারাজ, ভয়ে কবো না নির্ভয়ে কবো ?

রাজা বললেন—নির্ভয়ে কও ।

বানর বললে—মহারাজ, ভাঙা ঘরে মা আমার বড় দুঃখ পান । ঘরের দুয়োর ফাটা, চালে খড় নেই, শীতের হিম ঘরে আসে । মা আমার গায়ে দিতে নেপ পান না, আগুন জ্বালাতে কাঠ পান না, সারা রাত শীতে কাঁপেন ।

রাজা বললেন—তাইতো তাইতো ! একথা বলতে হয় ।বানর, তোর মাকে রাজবাড়িতে নিয়ে আয়, আমি মহল সাজাতে বলি ।

বানর বললে—মহারাজ, মাকে আনতে ভয় হয়, ছোটরানী বিষ খাওয়াবে ।

রাজা বললেন—সে ভয় নেই । নতুন মহলে রানীকে রাখব, মহল ঘিরে গড় কাটাব, গড়ের দুয়ারে পাহারা বসাব, ছোটরানী আসতে পারবে

না। সে মহলে বড়রানী থাকবেন, বড়রানীর বোবা-কালা দাই থাকবে, আর বড়রানীর পোষা ছেলে তুই থাকবি।

বানর বললে—মহারাজ, যাই তবে মাকে আনি।

রাজা বললেন—যাও মন্ত্রী, মহল সাজাও গে।

মন্ত্রী লক্ষ লক্ষ লোক লাগিয়ে একদিনে বড়রানীর নতুন মহল সাজালেন।

দুওরানী ভাঙা ঘর ছেড়ে, ছেঁড়া কাঁথা ছেড়ে, সোনার শাড়ি পরে নতুন মহলে এলেন। সোনার পালঙ্কে বসলেন, সোনার থালে ভাত খেলেন, দীন-দুঃখীকে দান দিলেন, রাজ্যে জয় জয় হল; রাগে ছোটরানীর সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী—ছোটরানীর 'মনের কথা', প্রাণের বন্ধু। ছোটরানী বলে পাঠালেন—মনের কথাকে আসতে বল, কথা আছে।

রানী ডেকেছেন—ডাকিনী বুড়ি তাড়াতাড়ি চলে এল।

রানী বললেন—এস ভাই, মনের কথা, কেমন আছ? কাছে বোসো।

ডাকিনী ব্রাহ্মণী ছোটরানীর পাশে বসে বললে—কেন ভাই, ডেকেছ কেন? মুখখানি ভার-ভার, চোখের কোণে জল, হয়েছে কি?

রানী বললেন—হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু! সতীন আবার ঘরে ঢুকেছে, সে সোনার শাড়ি পরেছে, নতুন মহল পেয়েছে, রাজার প্রেয়সী রানী হয়েছে! ভিখারিনী দুওরানী এতদিনে সুওরানীর রানী হয়ে রাজমহল জুড়ে বসেছে! বামুন সই, দেখে অঙ্গ জ্বলে গেল, আমায় বিষ দে খেয়ে মরি, সতীনের এ আদর প্রাণে সয় না!

ব্রাহ্মণী বললে—ছি ! ছি ! সই । ও কথা কি মুখে আনে ! কোন্ দুঃখে বিষ খাবে ? দুওরানী আজ রানী হয়েছে, কাল ভিখারিনী হবে, তুমি যেমন সুওরানী তেমনি থাকবে ।

সুওরানী বললেন—না ভাই, বাঁচতে আর সাধ নেই । আজ বাদে কাল দুওরানীর ছেলে হবে, সে ছেলে রাজ্য পাবে ! লোকে বলবে, আহা, দুওরানী রত্নগর্ভা, রাজার মা হল ! আর দেখ না, পোড়ামুখী সুওরানী মহারাজার সুওরানী হল, তবু রাজার কোলে দিতে ছেলে পেলে না ! ছি ! ছি ! অমন অভাগীর মুখ দেখে না, নাম করলে সারা দিন উপোস যায় ! ভাই, এ গঞ্জনা প্রাণে সবে না । তুই বিষ দে, হয় আমি খাই, নয়তো সতীনকে খাওয়াই ।

ব্রাহ্মণী বললে—চুপ কর রানী, কে কোন্‌দিকে শুনতে পাবে ! ভাবনা কি ? চুপি চুপি বিষ এনে দেব, দুওরানীকে খেতে দিও । এখন বিদায় দাও, বিষের সন্ধানে যাই ।

রানী বললেন—যাও ভাই । কিন্তু দেখো, বিষ যেন আসল হয়, খেতে-না-খেতে বড়রানী ঘুরে পড়বে ।

ডাকিনী বললে—ভয় নেই গো, ভয় নেই ! আজ বাদে কাল বড়রানীকে বিষ খাওয়াব, জন্মের মতো মা হবার সাধ ঘোচাব, তুমি নির্ভয়ে থাক ।

ডাকিনী বিষের সন্ধানে গেল । বনে বনে খুঁজে-খুঁজে ভর-সন্ধ্যাবেলা ঝোপের আড়ালে ঘুমন্ত সাপকে মন্ত্রে বশ করে, তার মুখ থেকে কালকূট বিষ এনে দিল ।

ছোটরানী সেই বিষে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই

গড়লেন। একখানা থালা সাজিয়ে ডাকিনী ব্রাহ্মণীকে বললেন—ভাই এক কাজ কর, এই বিষের নাড়ু বড়রানীকে বেচে আয়।

ব্রাহ্মণী থালা হাতে বড়রানীর নতুন মহলে গেল।

বড়রানী বললেন—আয় লো আয়, এতদিন কোথায় ছিলি ? দুওরানী বলে কি ভুলে থাকতে হয় ?

ডাকিনী বললে—সে কি গো ! তোমাদের খাই, তোমাদের পরি, তোমাদের কি ভুলতে পারি ? এই দেখ, তোমার জন্যে যতন করে মুগের নাড়ু, ক্ষীরের ছাঁচ, মতিচুর মেঠাই এনেছি।

রানী দেখলেন, বুড়ি ব্রাহ্মণী বড় যত্ন করে, থালা সাজিয়ে সামগ্রী এনেছে। খুশি হয়ে তার দুহাতে দুমুঠো মোহর দিয়ে বিদায় করলেন, ব্রাহ্মণী হাসতে-হাসতে চলে গেল।

রানী ক্ষীরের ছাঁচ ভেঙে খেলেন, জিবের স্বাদ গেল। মুগের নাড়ু মুখে দিলেন, গলা কাঠ হল। মতিচুর মেঠাই খেলেন, বুক যেন জ্বলে গেল। বানরকে ডেকে বললেন—ব্রাহ্মণী আমায় কি খাওয়ালে ! গা-কেমন করছে, বুঝি আর বাঁচব না।

বানর বললে—চল্ মা, খাটে শুবি, অসুখ সারবে।

রানী উঠে দাঁড়ালেন, সাপের বিষ মাথায় উঠল। রানী চোখে আঁধার দেখলেন, মাথা টলে গেল, সোনার প্রতিমা সানের উপর ঘুরে পড়লেন।

বানর রানীর মাথা কোলে নিলে, হাত ধরে নাড়ি দেখলে, চোখের পাতা খুলে চোখ দেখলে—রানী অজ্ঞান, অসাড় !

বানর সোনার প্রতিমা বড়রানীকে সোনার খাটে শুইয়ে দিয়ে ওষুধের

সন্ধানে বনে ছুটে গেল। বন থেকে কে জানে কি লতাপাতা, কোন গাছের কি শিকড় এনে নতুন শিলে বেটে বড়রানীকে খাওয়াতে লাগল।

রাজবাড়িতে খবর গেল—বড়রানী বিষ খেয়েছেন। রাজা উঠতে-পড়তে রানীর মহলে এলেন। রাজমন্ত্রী ছুটতে ছুটতে সঙ্গে এলেন। রাজবৈদ্য মন্তর আওড়াতে আওড়াতে তারপর এলেন। তারপর রাজার লোক-লস্কর, দাসী-বাঁদী যে যেখানে ছিল হাজির হল।

বানর বললে—মহারাজ, এত লোক কেন এনেছ ? আমি মাকে ওষুধ দিয়েছি, মা আমার ভালো আছেন, একটু ঘুমোতে দাও। এত লোককে যেতে বল।

রাজা বিষের নাড়ু পরখ করিয়ে রাজবৈদ্যকে বিদায় করলেন। রাজ্যের ভার দিয়ে রাজমন্ত্রীকে বিদায় করলেন। বড়রানীর মহলে নিজে রইলেন।

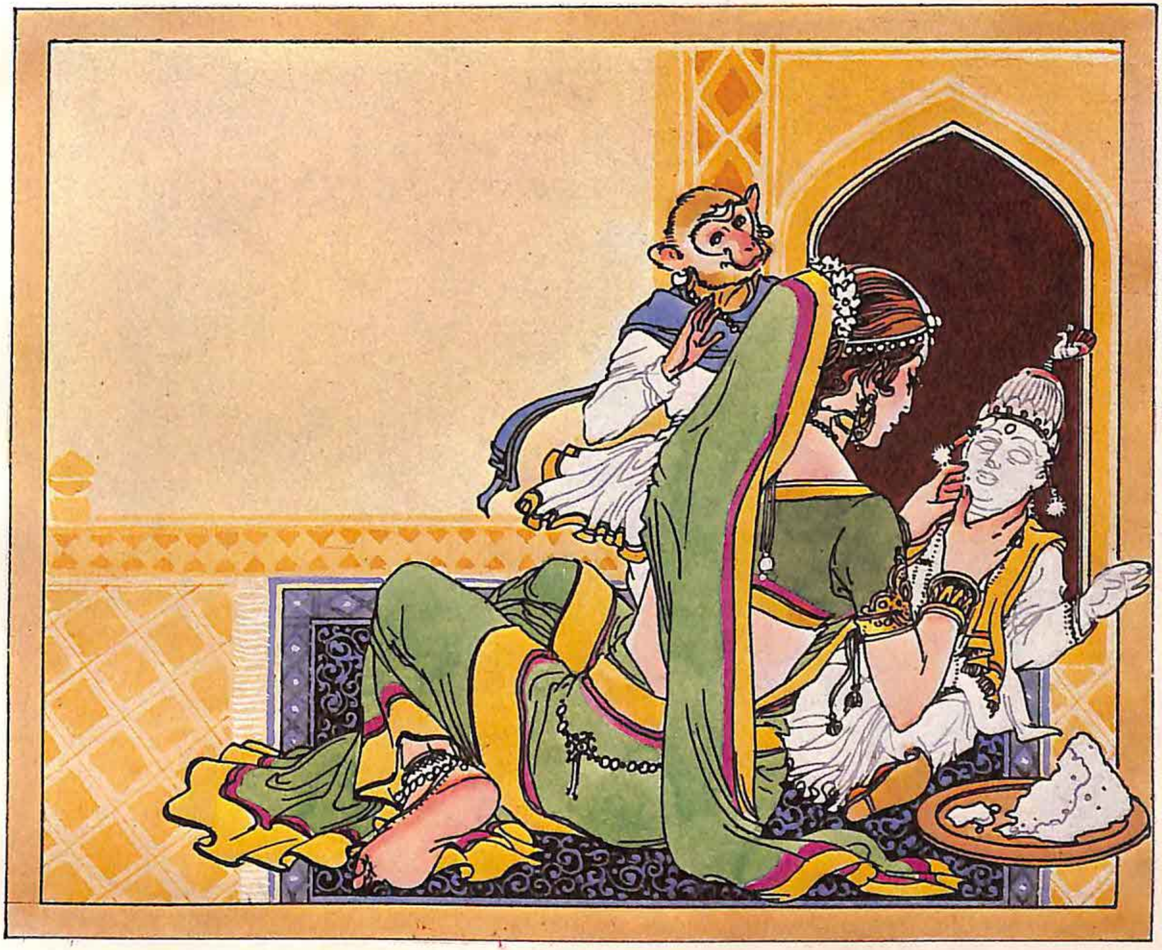
তিন দিন, তিন রাত বড়রানী অজ্ঞান। চার দিনে জ্ঞান হল, বড়রানী চোখ মেলে চাইলেন।

বানর রাজাকে এসে খবর দিলে—মহারাজ, বড়রানী সেরে উঠেছেন, তোমার একটি রাজচক্রবর্তী ছেলে হয়েছে।

রাজা বানরকে হীরের হার খুলে দিয়ে বললেন—চল বানর, বড়রানীকে আর বড়রানীর ছেলেকে দেখে আসি।

বানর বললে—মহারাজ, গণনা করেছি ছেলের মুখ এখন দেখলে তোমার চক্ষু অন্ধ হবে। ছেলের বিয়ে হলে মুখ দেখো, এখন বড়রানীকে দেখে এস ছোটরানী কি দুর্দশা করেছে।

রাজা দেখলেন—বিষের জ্বালায় বড়রানীর সোনার অঙ্গ কালি হয়ে





গেছে, পাতখানার মতো পড়ে আছেন, রানীকে আর চেনা যায় না !

রাজা রাজবাড়িতে এসে ছোটরানীকে প্রহরী-খানায় বন্ধ করলেন, আর ডাকিনী বুড়িকে মাথা মুড়িয়ে ঘোল ঢেলে, উলটো গাধায় চড়িয়ে দেশের বার করে দিলেন।

তারপর হুকুম দিলেন—মন্ত্রীবর, আজ বড় শুভদিন, এতদিন পরে রাজচক্রবর্তী ছেলে পেয়েছি। তুমি পথে-পথে আলো জ্বালাও, ঘরে-ঘরে বাজি পোড়াও, দীন-দুঃখী ডেকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দাও, রাজ্যে যেন একটিও ভিখারী না থাকে।

মন্ত্রী রাজার আজ্ঞায় নগরের পথে-পথে আলো দিলেন, ঘরে-ঘরে বাজি পোড়ালেন, দীন্-দুঃখীকে রাজভাণ্ডার লুটিয়ে দিলেন, রাজ্যে জয়-জয়কার হল।

এমনি করে নিত্য নতুন আমোদে, দেবতার মন্দিরে পূজা দিয়ে, মা কালীর পায়ে বলি দিয়ে দেখতে দেখতে দশ বৎসর কেটে গেল।

রাজা বানরকে ডেকে বললেন—দশ বৎসর তো পূর্ণ হল এখন ছেলে দেখাও !

বানর বললে—মহারাজ, আগে ছেলের বৌ ঠিক কর, তারপর তার বিয়ে দাও, তারপর মুখ দেখো ! এখন ছেলে দেখলে অন্ধ হবে।

রাজা বানরের কথায় দেশ-বিদেশে ভাট পাঠালেন। কত দেশের কত রাজকন্যার সন্ধান এল, একটিও রাজার মনে ধরল না। শেষে পাটলী দেশের রাজার ভাট সোনার কৌটোয় সোনার প্রতিমা রাজকন্যার ছবি নিয়ে এল ! কন্যার অঙ্গের বরণ কাঁচা সোনা, জোড়া-ভুরু—বাঁকাধনু, দুটি চোখ টানা-টানা, দুটি ঠোঁট হাসি-হাসি,

এলিয়ে দিলে মাথার কেশ পায়ে পড়ে। রাজার সেই কন্যা পছন্দ হল।

বানরকে ডেকে বললেন—ছেলের বৌ ঠিক করেছি, কাল শুভদিন শুভলগ্নে বিয়ে দিতে যাব।

বানর বললে—মহারাজ, কাল সন্ধ্যাবেলা, বেহারা দিয়ে বরের পাল্‌কি মায়ের দুয়ারে পাঠিয়ে দিও, বরকে নিয়ে বিয়ে দিতে যাব।

রাজা বললেন—দেখো বাপু, দশ বৎসর তোমার কথা শুনেছি, কাল ছেলে না দেখালে অনর্থ করব।

বানর বললে—মহারাজ, সে ভাবনা নেই। তুমি বেহাই-বাড়ি চলে যাও, আমরা কাল বর নিয়ে যাব।

রাজা পাছে রানীর ছেলেকে দেখে ফেলেন, পাছে চক্ষু অন্ধ হয়, সেই ভয়ে তাড়াতাড়ি বেহাই-বাড়ি চলে গেলেন।

আর বানর নতুন-মহলে বড়রানীর কাছে গেল।

বড়রানী ছেলের বিয়ে শুনে অবধি পড়ে পড়ে কাঁদছেন আর ভাবছেন—ছেলে কোথা পাব, এবার রাজাকে কি ছলে ভোলাব!

বানর এসে বললে—মা গো মা, ওঠ্‌। চেলীর জোড়, মাথার টোপর আন্‌, ক্ষীরের ছেলে গড়ে দে, বর সাজিয়ে বিয়ে দিয়ে আনি।

রানী বললেন—বাছারে, প্রাণে কি তোর ভয় নেই? কোন সাহসে ক্ষীরের পুতুল বর সাজিয়ে বিয়ে দিতে যাবি? রাজাকে কি ছলে ভোলাবি? বাছা কাজ নেই, ছল করে রাজার প্রেয়সী হলুম, সেই পাপে সতীন বিষ খাওয়ালে, ভাগ্যে-ভাগ্যে বেঁচে উঠেছি, আবার কোন সাহসে রাজার সঙ্গে ছল করব? বাছা ক্ষান্ত দে, কেন আর পাপের বোঝা বাড়াস! তুই রাজাকে ডেকে আন্‌, আমি সব কথা খুলে বলি।

বানর বললে—রাজাকে পাব কোথা ? দু-দিনের পথ কনের বাড়ি, রাজা সেখানে গেছেন। তুই কথা রাখ, ক্ষীরের বর গড়ে দে। রাজা পথ চেয়ে আছেন কখন বর আসবে, বর না এলে বড় অপমান। মা তুই ভাবিসনে, ক্ষীরের পুতুল বিয়ে দিতে পাঠালি, যদি ষষ্ঠীর কৃপা হয় তবে ষষ্ঠীদাস ষেঠের বাছা কোলে পাবি।

রানী বানরের ভরসায় বুক বেঁধে মনের মতো ক্ষীরের ছেলে গড়লেন। তাকে চেলীর জোড় পরালেন, সোনার টোপর পরালেন, জরির জুতো পায়ে দিলেন।

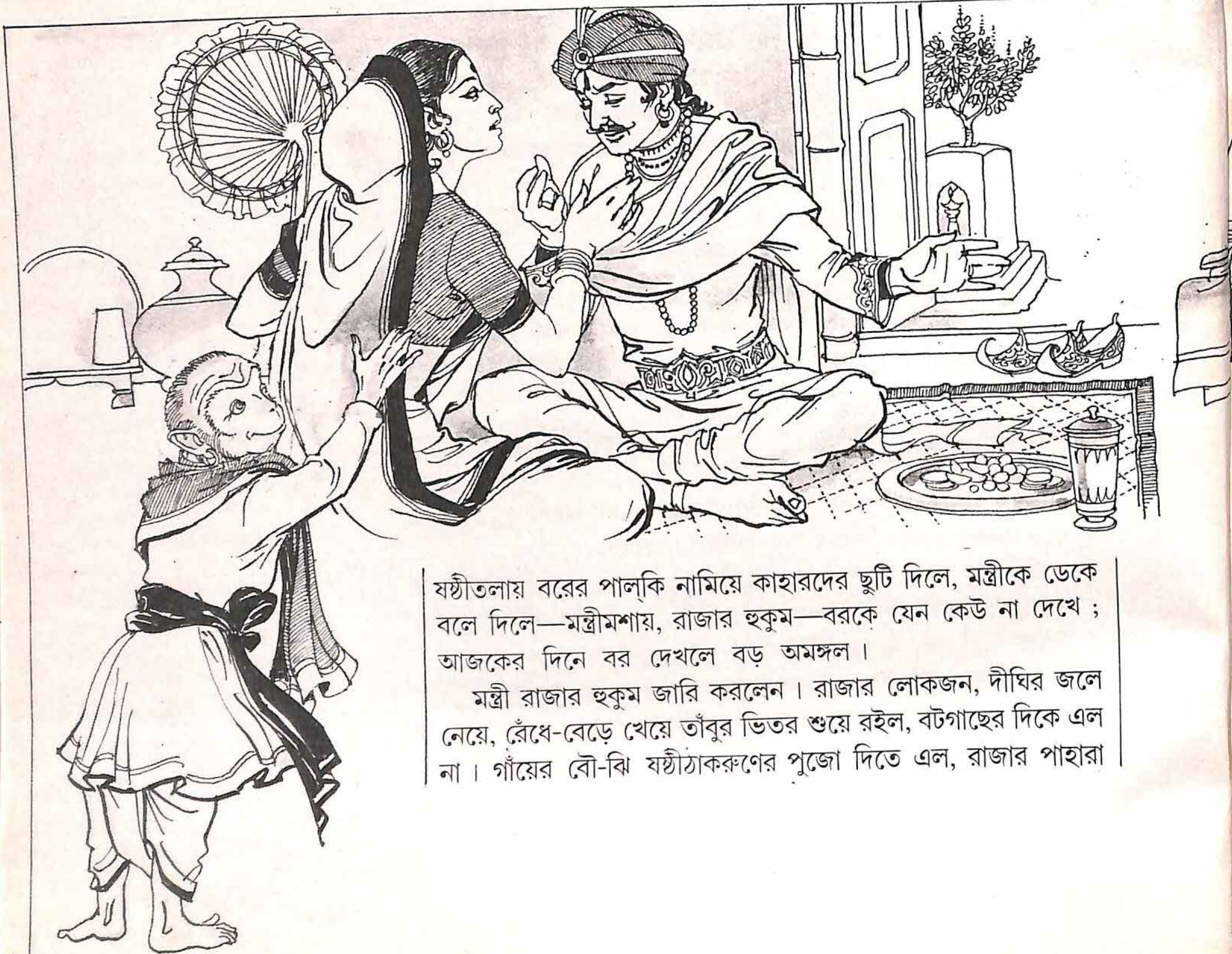
বানর চুপি-চুপি ক্ষীরের বর পাল্‌কিতে তুলে রঙিন ঢাকা নামিয়ে দিলে, বরের কেবল দু'খানি ছোট পা, দু-পাটি জরির জুতো দেখা যেতে লাগল।

ষোলো জন কাহার বরের পাল্‌কি কাঁধে তুললে। বানর মাথায় পাগড়ি, কোমরে চাদর বেঁধে, নিশেন উড়িয়ে, ঢাক বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ক্ষীরের পুতুলের বিয়ে দিতে গেল। রানী আঁধার পুরে একলা বসে বিপদ-ভঞ্জন বিঘ্নহরণকে ডাকতে লাগলেন।

এদিকে বর নিয়ে ষোলো কাহার, মশাল নিয়ে মশালধারী, ঢাক-ঢোল নিয়ে ঢাকি-ঢুলি, ঘোড়ায় চড়ে বরযাত্রী—সারারাত বাঁশি বাজিয়ে, আলো জ্বালিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে দিগ্‌নগরে এসে পড়ল।

দিগ্‌নগরে দীঘির ধারে ভোর হল। মশাল পুড়ে-পুড়ে নিবে গেল, ঘোড়া ছুটে-ছুটে বেদম হল, কাহার পাল্‌কি বয়ে হয়রান হল, ঢাক পিটে ঢাকির হাতে খিল ধরল।

বানর দীঘির ধারে তাঁবু ফেলতে হুকুম দিলে। দীঘির ধারে



ষষ্ঠীতলায় বরের পাল্‌কি নামিয়ে কাহারদের ছুটি দিলে, মন্ত্রীকে ডেকে বলে দিলে—মন্ত্রীমশায়, রাজার হুকুম—বরকে যেন কেউ না দেখে ; আজকের দিনে বর দেখলে বড় অমঙ্গল।

মন্ত্রী রাজার হুকুম জারি করলেন। রাজার লোকজন, দীঘির জলে নেয়ে, রেঁধে-বেড়ে খেয়ে তাঁবুর ভিতর শুয়ে রইল, বটগাছের দিকে এল না। গাঁয়ের বৌ-ঝি ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো দিতে এল, রাজার পাহারা



হাঁকিয়ে দিলে।

সেদিন বটতলায় ষষ্ঠীঠাকরুণের পুজো হল না। ষষ্ঠীঠাকরুণ খিদের জ্বালায় অস্থির হলেন, তেষ্টায় গলা শুকিয়ে কাঠ হল। বানর মনে মনে হাসতে লাগল।

এমনি বেলা অনেক হল। ষষ্ঠীঠাকরুণের মুখে জলবিন্দু পড়ল না, ঠাকরুণ কাঠামোর ভিতর ছটফট করতে লাগলেন, ঠাকরুণের কালো

বেড়াল মিউ-মিউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে-মনে ফন্দি এঁটে পাল্‌কির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ভাবলেন—আঃ আপদ গেল! কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে-খুঁজতে দেখেন, পাল্‌কির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুণ আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে-মনে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগ্‌নগরে যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগ্‌নগরে ষষ্ঠীরদাস ষেঠের-বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে, সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুণের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগ্‌নগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন—ঠাকরুণ, দিন-দুপুরে ডেকেছেন কেন?

ঠাক্‌রুণ বললেন—বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলে, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী

হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগ্‌নগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন—জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দীঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানীর বানর। আর জেগে রইল, ষষ্ঠীরদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদ্‌বেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগ্‌নগরে দীঘির ঘাটে বরযাত্রীর ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে-ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে—ঠাকরুণ, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুণ ভয় পেয়ে বললেন—আঃ মর! এ মুখপোড়া বলে কি! সর সর, আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে!

বানর বললে—তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব। নয়তো কাঠামোসুদ্ধ আজ তোমায় দীঘির জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা

বেড়াল মিউ-মিউ করে কাঁদতে লাগল। বানর তখন মনে-মনে ফন্দি এঁটে পাল্‌কির দরজা খুলে রেখে আড়ালে গেল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ভাবলেন—আঃ আপদ গেল! কাঠফাটা রোদে কাঠামো থেকে বার হয়ে নৈবেদ্যের ছোলাটা কলাটা সন্ধান করতে লাগলেন। খুঁজতে-খুঁজতে দেখেন, পাল্‌কির ভিতর ক্ষীরের পুতুল। ঠাকরুণ আর লোভ সামলাতে পারলেন না, মনে-মনে ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসিকে স্মরণ করলেন।

দিগ্‌নগরে যখন দিন, ঘুমের দেশে তখন রাত। ঘুমপাড়ানি মাসি-পিসি সারারাত দিগ্‌নগরে ষষ্ঠীরদাস যেঠের-বাছা ছেলেদের চোখে ঘুম দিয়ে, সকালবেলা ঘুমের দেশে রাজার মেয়েকে ঘুম পাড়িয়ে, অনেক বেলায় একটুখানি চোখ বুজেছেন, এমন সময় ষষ্ঠীঠাকরুণের ডাক পড়ল। ঘুমের দেশে ঘুমপাড়ানি মাসি জেগে উঠলেন, ঘুমপাড়ানি পিসি উঠে বসলেন, দুই বোনে ঘুমের দেশ ছেড়ে দিগ্‌নগরে এলেন। ষষ্ঠীর পায়ে প্রণাম করে বললেন—ঠাকরুণ, দিন-দুপুরে ডেকেছেন কেন?

ঠাকরুণ বললেন—বাছারা, এতখানি বেলা হল এখনও ভোগ পাইনি। তোরা একটি কাজ কর, দেশের যে যেখানে আছে ঘুম পাড়িয়ে দে, আমি ডুলির ভিতর ক্ষীরের পুতুলটি খেয়ে আসি।

ষষ্ঠীঠাকরুণের কথায় মাসি-পিসি মায়া করলে, দেশের লোক ঘুমিয়ে পড়ল। মাঠের মাঝে রাখাল, ঘরের মাঝে খোকা, খোকার পাশে খোকার মা, খেলাঘরে খোকার দিদি ঘুমিয়ে পড়ল। ষষ্ঠীতলায় রাজার লোকজন, পাঠশালায় গাঁয়ের ছেলেপিলে ঘুমিয়ে পড়ল। রাজার মন্ত্রী

হুঁকোর নল মুখে ঘুমিয়ে পড়লেন, গাঁয়ের গুরু বেত হাতে ঢুলে পড়লেন। দিগ্‌নগরে দিনে-দুপুরে রাত এল। মাসি-পিসি সবার চোখে ঘুম দিলেন—জেগে রইল গাঁয়ের মাঝে রাস্তার শেয়াল-কুকুর, দীঘির ধারে রাজার হাতি-ঘোড়া, বনের মাঝে বনের পাখি, গাছের ডালে রানীর বানর। আর জেগে রইল, ষষ্ঠীরদাস বনের বেড়াল, জলের বেড়াল, গাছের বেড়াল, ঘরের বেড়াল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তখন ডুলি খুলে ক্ষীরের ছেলে হাতে নিলেন। ক্ষীরের গন্ধে গাছ থেকে কাঠবেড়াল নেমে এল, বন থেকে বনবেড়াল ছুটে এল, জল থেকে উদ্‌বেড়াল উঠে এল, কুনোবেড়াল কোণ ছেড়ে ষষ্ঠীতলায় চলে এল।

ষষ্ঠীঠাকরুণ ক্ষীরের ছেলের দশটি আঙুল বেড়ালদের খেতে দিলেন। নিজে ক্ষীরের হাত, ক্ষীরের পা, ক্ষীরের বুক পিঠ মাথা খেয়ে, ক্ষীরের দুটি কান মাসি-পিসির হাতে দিয়ে বিদায় করলেন।

মাসি-পিসি ঘুমের দেশে চলে গেলেন, দিগ্‌নগরে দীঘির ঘাটে বরযাত্রীর ঘুম ভাঙল, গাঁয়ের ভিতর ঘরে-ঘরে গ্রামবাসীর ঘুম ভাঙল। ষষ্ঠীঠাকরুণ তাড়াতাড়ি মুখ মুছে কাঠামোয় ঢুকতে যাবেন, এমন সময় বানর গাছ থেকে লাফিয়ে পড়ে বললে—ঠাকরুণ, পালাও কোথা, আগে ক্ষীরের ছেলে দিয়ে যাও! চুরি করে ক্ষীর খাওয়া ধরা পড়েছে, দেশ-বিদেশে কলঙ্ক রটাব।

ঠাকরুণ ভয় পেয়ে বললেন—আঃ মর! এ মুখপোড়া বলে কি! সর সর, আমি পালাই, লোকে আমায় দেখতে পাবে!

বানর বললে—তা হবে না, আগে ছেলে দাও তবে ছেড়ে দেব। নয়তো কাঠামোসুদ্ধ আজ তোমায় দীঘির জলে ডুবিয়ে যাব, দেবতা

হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুণ লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন—বাছা চুপ কর, কে কোন্ দিকে শুনতে পাবে ? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি, ফিরে পাব কোথা ? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুওরানী তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে—কই ঠাকরুণ, বটতলায় তো ছেলেরা নেই ! আমায় দিব্যচক্ষু দাও, তবে তো ষষ্ঠীরদাস ষেঠের বাছাদের দেখতে পাব ! ষষ্ঠীঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে-স্থলে, পথে-ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুম্‌ঝুম্ করছে, কেউবা পায়ের নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা-রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টক্‌বক্ হাঁকাচ্ছে, একদল দীঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল গাছের তলায় ফুল কুড়চ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে,



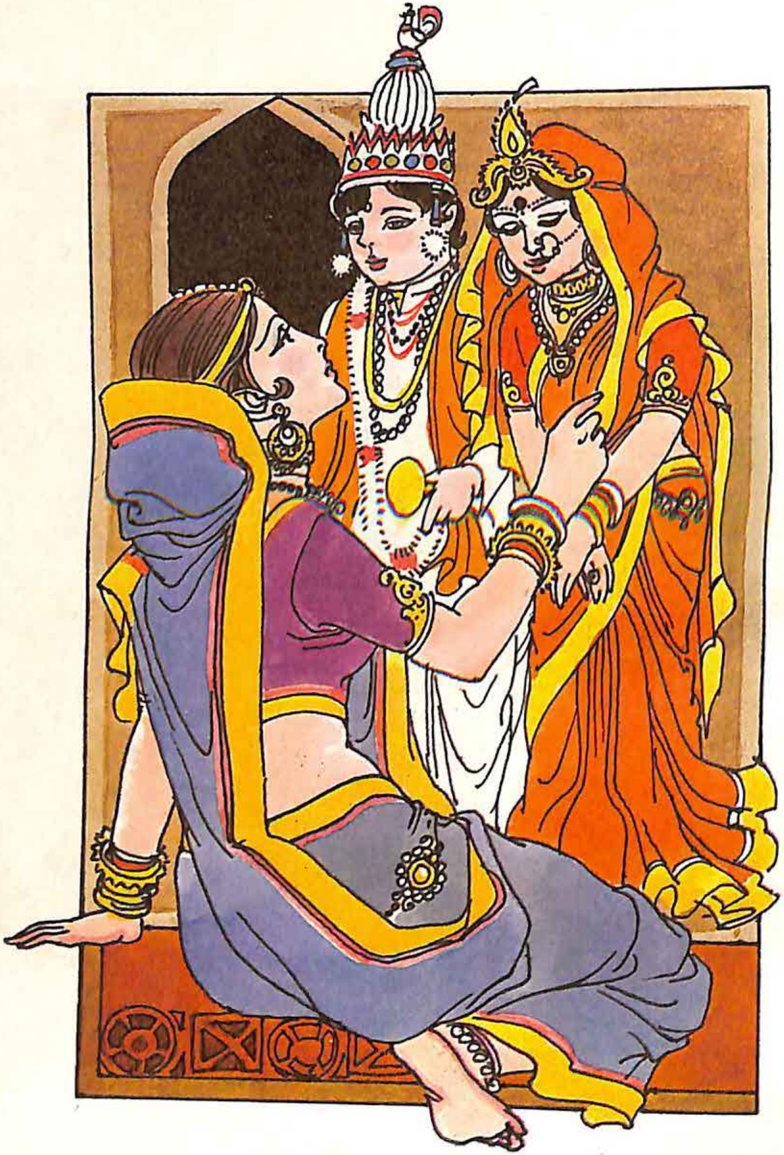
হয়ে ক্ষীর চুরির শাস্তি হবে।

ঠাকরুণ লজ্জায় মরে গেলেন, ভয়ে কাঁপতে-কাঁপতে বললেন—বাছা চুপ কর, কে কোন্ দিকে শুনতে পাবে ? তোর ক্ষীরের ছেলে খেয়ে ফেলেছি, ফিরে পাব কোথা ? ওই বটতলায় আমার ছেলেরা খেলা করছে, তোর যেটিকে পছন্দ সেটিকে নিয়ে বিয়ে দিগে যা, আমার বরে দুওরানী তাকে আপনার ছেলের মতো দেখবে, এখন আমায় ছেড়ে দে।

বানর বললে—কই ঠাকরুণ, বটতলায় তো ছেলেরা নেই ! আমায় দিব্যচক্ষু দাও, তবে তো ষষ্ঠীরদাস যেঠের বাছাদের দেখতে পাব ! ষষ্ঠীঠাকরুণ বানরের চোখে হাত বোলালেন, বানরের দিব্যচক্ষু হল।

বানর দেখলে—ষষ্ঠীতলা ছেলের রাজ্য, সেখানে কেবল ছেলে—ঘরে ছেলে, বাইরে ছেলে, জলে-স্থলে, পথে-ঘাটে, গাছের ডালে, সবুজ ঘাসে যেদিকে দেখে সেইদিকেই ছেলের পাল, মেয়ের দল। কেউ কালো, কেউ সুন্দর, কেউ শ্যামলা। কারো পায়ে নূপুর, কারো কাঁকালে হেলে, কারো গলায় সোনার দানা। কেউ বাঁশি বাজাচ্ছে, কেউ ঝুমঝুমি ঝুম্‌ঝুম্ করছে, কেউবা পায়ের নূপুর বাজিয়ে-বাজিয়ে কচি হাত ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে নেচে বেড়াচ্ছে। কারো পায়ে লাল জুতুয়া, কারো মাথায় রাঙা টুপি, কারো গায়ে ফুলদার লক্ষ টাকার মলমলি চাদর। কোনো ছেলে রোগা-রোগা, কোনো ছেলে মোটাসোটা, কেউ দস্যি, কেউ লক্ষ্মী। একদল কাঠের ঘোড়া টক্‌বক্ হাঁকাচ্ছে, একদল দীঘির জলে মাছ ধরছে, একদল বাঁধের জলে নাইতে নেমেছে, একদল গাছের তলায় ফুল কুড়চ্ছে, একদল গাছের ডালে ফল পাড়ছে,





চারিদিকে খেলাধুলো, মারামারি, হাসিকান্না। সে এক নতুন দেশ, স্বপ্নের রাজ্য। সেখানে কেবল ছুটোছুটি, কেবল খেলাধুলো ; সেখানে পাঠশালা নেই, পাঠশালের গুরু নেই, গুরুর হাতে বেত নেই। সেখানে আছে দীঘির কালো জল, তার ধারে সর বন, তেপান্তর মাঠ, তারপরে আম-কাঁঠালের বাগান, গাছে-গাছে ন্যাজঝোলা টিয়ে পাখি, নদীর জলে গোল-চোখ বোয়াল মাছ, কচু বনে মশার ঝাঁক। আর আছেন বনের ধারে বনগাঁ-বাসী মাসি-পিসি, তিনি খৈয়ের মোয়া গড়েন, ঘরের ধারে ডালিম গাছটি তাতে প্রভু নাচেন ! নদীর পারে জন্তীগাছটি তাতে জন্তী ফল ফলে, সেখানে নীলে ঘোড়া মাঠে-মাঠে চরে বেড়াচ্ছে, গৌড় দেশের সোনার ময়ূর পথে-ঘাটে গড়াগড়ি যাচ্ছে। ছেলেরা সেই নীলে ঘোড়া নিয়ে, সেই সোনার ময়ূর দিয়ে ঘোড়া সাজিয়ে, ঢাক মৃদং ঝাঁঝর বাজিয়ে, ডুলি চাপিয়ে কমলাপুলির দেশে পুঁটুরাণীর বিয়ে দিতে যাচ্ছে। বানর কমলাপুলির দেশে গেল। সে টিয়েপাখির দেশ, সেখানে কেবল ঝাঁকে-ঝাঁকে টিয়ে পাখি, তারা দাঁড়ে বসে ধান খোঁটে, গাছে বসে কেঁচ্‌মেচ্‌ করে, আর সে-দেশের ছেলেদের নিয়ে খেলা করে। সেখানে লোকেরা গাই-বলদে চাষ করে, হীরে দিয়ে দাঁত ঘষে। সে এক নতুন দেশ—সেখানে নিমেষে সকাল, পলকে সন্ধ্যা হয়, সেই দেশের কাণ্ডই এক ! ঝুরঝুরে বালির মাঝে চিক্‌চিকে জল, তারি ধারে এক পাল ছেলে দোলায় চেপে ছ-পণ কড়ি গুণতে-গুণতে মাছ ধরতে এসেছে ; কারো পায়ে মাছের কাঁটা ফুটেছে, কারো চাঁদমুখে রোদ পড়েছে ! জেলেদের ছেলে জাল মুড়ি দিয়ে ঘুম দিচ্ছে।—এমন সময় টাপুর-টুপুর বৃষ্টি এল, নদীতে বান এল ; অমনি সেই ছেলের পাল, সেই কাঠের দোলা, সেই

ছ-পণ কড়ি ফেলে, কোন্ পাড়ায় কোন্ ঘরের কোণে ফিরে গেল। পথের মাঝে তাদের মাছগুলো চিলে কেড়ে নিলে, কোলা ব্যাঙে ছিপগুলো টেনে নিলে, খোকাবাবুরা ক্ষেপ্ত হয়ে ঘরে এলেন, মা তপ্ত দুধ জুড়িয়ে খেতে দিলেন। আর সেই চিক্‌চিকে জলের ধারে ঝুরঝুরে বালির চরে শিবঠাকুর এসে নৌকা বাঁধলেন, তাঁর সঙ্গে তিন কন্যে—এক কন্যে রাঁধলেন, বাড়লেন, এক কন্যে খেলেন আর এক কন্যে না-পেয়ে বাপের বাড়ি গেলেন ; বানর তাঁর সঙ্গে বাপের বাড়ির দেশে গেল। সেখানে জলের ঘাটে মেয়েগুলি নাইতে এসেছে, কালো-কালো চুলগুলি ঝাড়তে লেগেছে। ঘাটের দু-পাশে দুই রুই-কাতলা ভেসে উঠল, তার একটি গুরুঠাকুর নিলেন, আর একটি নায়ে ভরা দিয়ে টিয়ে আসছিল, সে নিলে। তাই দেখে ভোঁদড় টিয়েকে এক হাতে নিয়ে আর মাছকে এক হাতে নিয়ে নাচতে আরম্ভ করলে, ঘরের দুয়ারে খোকার মা খোকাবাবুকে নাচিয়ে-নাচিয়ে বললেন—ওরে ভোঁদড় ফিরে চা, খোকার নাচন দেখে যা।

বানর দেখলে—ছেলেটি বড় সুন্দর, যেন সোনার চাঁদ, তাড়াতাড়ি ছেলেটিকে কেড়ে নিলে ! অমনি ষষ্ঠীতলার সেই স্বপ্নের দেশ কোথায় মিলিয়ে গেল, ন্যাজঝোলা টিয়েপাখি আকাশ সবুজ করে কোন্ দেশে উড়ে গেল, শিবঠাকুরের নৌকো কোন্ দেশে ভেসে গেল। ঘাটের মেয়েরা ডুরে শাড়ি ঘুরিয়ে পরে চলে গেল। ষষ্ঠীর দেশে কুনোবেড়াল কোমর বেঁধে, শাশুড়ি ভোলাতে উড়কি ধানের মুড়কি নিয়ে, চার মিন্‌সে কাহার নিয়ে, চার মাগী দাসী সঙ্গে, আমকাঁটালের বাগান দিয়ে পুঁটুরানীকে শ্বশুরবাড়ি নিয়ে যেতে-যেতে আমতলার অন্ধকারে মিশে

গেল। তেঁতুল গাছের ভোঁদড়গুলো নাচতে-নাচতে পাতার সঙ্গে মিলিয়ে গেল—দেশটা যেন মাটির নিচে ডুবে গেল!

বানর দেখলে—কোথায় ষষ্ঠীঠাকরুণ, কোথায় কে? বটতলায় দীঘির ধারে ছেলে কোলে একলা দাঁড়িয়ে আছে! তখন বানর লোকজন ডেকে সেই সোনার চাঁদ ছেলেটিকে পাল্‌কি চড়িয়ে, আলো জ্বালিয়ে বাদ্যি বাজিয়ে সন্ধ্যাবেলা দিগ্‌নগর ছেড়ে গেল।

এদিকে পাটলি দেশে বেয়াইবাড়ি বসে-বসে রাজা ভাবছেন—বানর এখনো এল না? আমার সঙ্গে ছল করলে? রাজ্যে গিয়ে মাথা কাটব। বিয়ের কনেটি ভাবছে—না জানি বর দেখতে কেমন? কনের মা-বাপ ভাবছে—আহা, বুকের বাছা পর হয়ে কার ঘরে চলে যাবে। রাজবাড়ির চাকর-দাসীরা ভাবছে—কাজ কখন সারা হবে, ছাদে উঠে বর দেখব। এমন সময় গুরু-গুরু ঢোল বাজিয়ে, পোঁ-পোঁ বাঁশি বাজিয়ে, টক্‌বক্ ঘোড়া হাঁকিয়ে, ঝক্‌মক্ আলো জ্বালিয়ে, বানর বর নিয়ে এল। রাজা ছেলেকে হাত ধরে সভায় বসালেন, কনের বাপ বিয়ের সভায় মেয়ের হাত জামাইয়ের হাতে সঁপে দিলেন, পাড়া-পড়শী বরকে বরণ করলে, দাস-দাসী শাঁখ বাজালে, হুলু দিলে—বর কনের বিয়ে হল।

রাজা ছেলের বিয়ে দিয়ে তার পরদিন বৌ নিয়ে, ছেলে নিয়ে, বাঁশি বাজিয়ে, ঘোড়া হাঁকিয়ে বানরের সঙ্গে দেশে ফিরলেন। পাটলি দেশের রাজার বাড়ি এক রাত্তিরে শূন্য হয়ে গেল, মা-বাপের কোলের মেয়ে পরের ঘরে চলে গেল।

এদিকে রাজার দেশে বড়রানী দু-দিন দু-রাত কেঁদে-কেঁদে, ভেবে-ভেবে ভোরবেলা ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন—ষষ্ঠীঠাকরুণ

বলছেন, রানী, ওঠ্ চেয়ে দেখ্, তোর কোলের বাছা ঘরে এল। রানী ঘুম ভেঙে উঠে বসলেন, দুয়ারে শুনলেন দাসীরা ডাকছে—ওঠ গো রানী ওঠ, পাটের শাড়ি পর, বৌ-বেটা বরণ করগে!

রানী পাটের শাড়ি পরে বাইরে এলেন। এসে দেখলেন সত্যিই রাজা বৌ-বেটা এনেছেন! হাসিমুখে বর-কনেকে কোলে নিলেন, ষষ্ঠীর বরে দুঃখের দিনের ক্ষীরের ছেলের কথা মনে রইল না, ভাবলেন ছেলের জন্য ভেবে-ভেবে ক্ষীরের ছেলে স্বপ্ন দেখেছি।

রাজা এসে ছেলেকে রাজ্য যৌতুক দিলেন, সেই রাজ্যে বানরকে মন্ত্রী করে দিলেন, আর ছেলের বৌকে মায়ারাজ্যের সেই আট হাজার মানিকের আটগাছি চুড়ি, দশশো ভরি সোনার সেই দশগাছা মল পরিয়ে দিলেন। কন্যের হাতে মানিকের চুড়ি যেন রক্ত ফুটে পড়ল, পায়ে মল রিনিঝিনি বাজতে লাগল, ঝিকিমিকি জ্বলতে লাগল।

হিংসেয় ছোটরানী বুক ফেটে মরে গেল ॥



ক্ষীরের পুতুল

এক রাজার দুই রানী। দুও আর সুও।
রাজামশাই বাণিজ্যে গেলেন। সুওরানীর কথা মত নিয়ে এলেন দামী দামী গয়না আর শাড়ি। দুওরানী চেয়েছিলেন একটা বানর-ছানা। তাঁর জন্য এল তাই বানর।
বানর হলে হবে কি, আসলে সে এক জাদুকরের দেশের মায়া-বানর। তাই সে মানুষের মত কথা বলে, ছেলের মত ভালবাসে বড় রানীমাকে, দুঃখিনী মায়ের চোখের জল মুছিয়ে দিতে চায়।
তা, সেই মায়া-বানর দারুণ বুদ্ধি খাটিয়ে কী করে রাজার মন ফেরাল বড় রানীর দিকে, কী করে দুওরানীর কোলে এনে দিল সত্যিকারের রাজপুত্র, কী করেই বা হিংসুটে সুওরানীকে ভোগ করাল যাবতীয় পাপের শাস্তি—তাই নিয়েই এই অবাক-করা রূপকথা, 'ক্ষীরের পুতুল'।
আর, এ-গল্প যিনি শুনিয়েছেন, তিনিও এক অবাক-করা জাদুকর। ছবি তাঁর হাতে কথা, কথা হয়ে উঠত ছবির মতন।
আনন্দ সংস্করণ 'ক্ষীরের পুতুল'-এ বার পৃষ্ঠা চোখ-জুড়োনো রঙীন ছবি।